দারিদ্র্য বিমোচনে
একটি বাড়ি একটি খামার
কৃষি প্রযুক্তি



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

দারিদ্র্য বিমোচনে একটি বাড়ি একটি খামার কৃষি প্রযুক্তি

সংকলন ও সম্পাদনায়

ডঃ মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী
সদস্য পরিচালক (শস্য)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

মোঃ মনোয়ার হোসেন
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (টিটিএমইউ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

ডঃ মোঃ আবদুল কাইয়ুম
প্রাক্তন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট
গাজীপুর।



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা

প্রকাশনায় লেখকের উদ্বৃতি (Citation)
এম কে এ চৌধুরী, এম এম হোসেন ও এম এ কাইয়ুম। (২০১১),
দারিদ্র্য বিমোচনে একটি বাড়ি একটি খামার কৃষি প্রযুক্তি,
বিএআরসি, ঢাকা

প্রকাশনায়
প্রযুক্তি হস্তান্তর ও পরিবীক্ষণ ইউনিট
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মোঃ মনোয়ার হোসেন
আফরোজা আনজুম
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

প্রকাশকাল
জুলাই, ২০১১ইং

অর্থায়নে
পিআইইউ-বিএআরসি, এনএটিপি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

মুদ্রনে
ডাইনামিক প্রিন্টার্স
৫৩/১, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-০৩৬৮২৯

Minister
Ministry of Agriculture
Government of People's Republic of Bangladesh



মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা-র সরকার অঙ্গিকারবদ্ধ। গ্রামীণ সম্পদের সর্বাত্বক ব্যবহার করে দেশের উন্নয়নে কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। এ দেশের প্রতিটি বাড়িকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির এককে রূপান্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য মোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ‘দারিদ্র্য বিমোচনে একটি বাড়ি একটি খামার’ কৃষি প্রযুক্তি পুস্তিকাটি প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই কৃষির সকল শাখায় উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। সে বিবেচনায় এ পুস্তিকাটি একটি প্রয়োগধর্মী প্রকাশনা বলে আমি মনে করছি। কৃষি প্রযুক্তিসমূহ কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য সকলকে অধিকতর আন্তরিক হতে হবে।

‘দারিদ্র্য বিমোচনে একটি বাড়ি একটি খামার’ কৃষি প্রযুক্তি পুস্তিকাটি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(মতিয়া চৌধুরী)

Secretary
Ministry of Agriculture
Government of People's Republic of Bangladesh



সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাণী

দারিদ্র্য দূরীকরণ বাংলাদেশ সরকারের একটা অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে কৃষি মন্ত্রণালয় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে 'দারিদ্র্য বিমোচনে একটি বাড়ি একটি খামার কৃষি প্রযুক্তি' পুস্তিকাটিতে সম্মিলিত আকারে কৃষি প্রযুক্তি সমূহ প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এ সময়ের একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করেছে বলে মনে করি। সকল শ্রেনীর বসতবাড়িতে মহিলা ও পুরুষের অংশগ্রহনে প্রযুক্তি নির্ভর কর্মকান্ডের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। আমি আশাকরি কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের কাছেও পুস্তিকাটি খুবই সমাদৃত হবে। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

এ পুস্তিকাটি প্রকাশের প্রচেষ্টার সাথে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল' এর সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অভিনন্দন।

(সি কিউ কে মুসতাক আহমদ)

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ পৃথিবীতে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ সমূহের মধ্যে অন্যতম। মোট জনসংখ্যার ৭৬% গ্রামে বসবাস করে এবং মূলতঃ কৃষিজীবি। এ দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৬.৩ ভাগ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে, যার মধ্যে ১৮% চরম দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতা এবং খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার।

গ্রামীন জনসংখ্যার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেনীর কৃষকের হার শতকরা ৮০ ভাগ। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। স্বল্প জমি ও সীমিত আয়ের কারণে এদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় আমিষ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। ফলে সময়ের আবর্তনে পুষ্টিস্বল্পতা, পরিবর্তিত আবহাওয়ার বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি এদের জীবন যাত্রার মান ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে চলেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় হতেই দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্ব সহকারে প্রচেষ্টা গ্রহন করায় বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্য হার হ্রাস পেয়ে থাকলেও এদেশে এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে।

দারিদ্র্য বিমোচন বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচনকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে পরিকল্পিত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য সম্পূর্ণভাবে নির্মূলে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশের সরকারের অন্যতম সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য হলো ২০০৫ সনে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী ৫৬.৬ শতাংশ জনগোষ্ঠির অনুপাত ২০১৫ সনে ২৯ শতাংশে কমিয়ে আনা।

এ প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত "একটি বাড়ি একটি খামার" আজকের সময়ে একটি বলিষ্ঠ ও সমায়োপযোগী পদক্ষেপ। কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দীর্ঘ দিনের মাঠ পর্যায়ে 'সমন্বিত খামার পদ্ধতি' গবেষণা অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে এলাকাভেদে বড়, মাঝারী, ছোট, প্রান্তিক এবং ভূমিহীন কৃষকদের জন্য নির্দিষ্টভাবে গ্রহনোপযোগী প্রযুক্তি এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব। সকল শ্রেণীর কৃষকের সংসারের আয় বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদার পূরনের ক্ষেত্রে বসতবাড়ির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উৎপাদনের প্রচলিত ভূমি ছাড়াও ছোট ছোট বাড়ি ঘিরে আঙ্গিনায় শাকসবজি, পুকুর পাড়ে লাউ-কুমড়া, নালা-ডোবায় মাছ চাষ, আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগী পালন, ঘরের চালে-মাচায় সবজি এবং ছায়ায় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শস্য উৎপন্ন করে বাংলাদেশের বসত বাড়িগুলিতে আরো অনেক অর্থ রোজগার, পুষ্টি সরবরাহ এবং কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। তাছাড়াও গ্রামীন জনগোষ্ঠির শহরমূখী ও কর্মবিমূখী প্রবনতা অনেকাংশে রোধ পাবে।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সকল জাতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও কৃষি সম্প্রসারন বিভাগের অংশগ্রহনে সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে "একটি বাড়ি একটি খামার" সংশ্লিষ্ট লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর খামার বিন্যাস ও গবেষণা বিভাগ এবং অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে যে প্রযুক্তিগুলো আমাদের গ্রামীণ বসতবাড়িতে প্রয়োগ করে ফসল, গবাদিপশু ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং যা ইতিমধ্যে পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, মূলত এ কর্মশালা থেকে উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক সেই সব প্রযুক্তিগুলো চয়ন করে এ পুস্তিকায় সংযোজন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের মাধ্যমেও অন্যান্য কৃষি প্রযুক্তি এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী অকৃষি প্রযুক্তি সমূহ সংগ্রহ করে সেগুলো এ প্রকাশনায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংকলিত প্রযুক্তি সমূহের বাস্তব প্রয়োগের জন্য কৃষকের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি স্থানীয় বাজার ও উপজেলা সদর থেকে সংগ্রহ করা যাবে। কৃষক যাতে সহজে মানসম্পন্ন উপকরণাদি সংগ্রহ করতে পারে সে জন্য কৃষি সম্প্রসারণ, প্রাণি সম্পদ ও মৎস্য অধিদপ্তর সমূহের মাঠকর্মীদের অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা প্রয়োজন হবে। সকল বিভাগীয় সম্প্রসারণ কর্মীগণ পরিবারের সদস্যদের প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে সরেজমিনে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন এবং ছোট ছোট প্রদর্শনীর মাধ্যমে তার বাস্তব প্রয়োগ দেখাবেন। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠি দেশের জীবনমানের উন্নয়নে, দারিদ্র্য বিমোচনে ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

কৃষি সম্প্রসারণ পর্যায়ে নিয়োজিত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সমন্বয়ে "দারিদ্র্য বিমোচনে একটি বাড়ি একটি খামার" কৃষি প্রযুক্তি এর সমন্বিত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সুষম পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যসহ পারিবারিক স্বচ্ছলতা, পরিবেশ উন্নয়ন সর্বোপরি জাতীয় দারিদ্র্য বিমোচনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারে যা আমাদের সহস্রাব্দ উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে।

ড. ওয়ায়েস কবীর
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি

সূচীপত্র

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের আর্থ-সামাজিক এক কথায় সার্বিক উন্নয়ন কৃষির সাথে ওতপ্রতোভাবে জড়িত। কৃষিকে কেন্দ্র করে এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা আজও অবিচল। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি কৃষির সংগে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত এবং ৬২% কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। দেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান প্রায় ২০.৬% এবং বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি ৪.৬৩% যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য হচ্ছে। দেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫ সালে দেশের জনসংখ্যা ১৭০ মিলিয়নেরও অধিক হবে। তখন জনসংখ্যার ঘনত্ব ৯৮০ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৫০ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটারে দাড়াবে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৯১ লক্ষ হেক্টর চাষাবাদের জমি আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বসতি স্থাপন, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট নির্মান ও নদী ভাঙ্গনের কারণে প্রতি বৎসর প্রায় ১% হারে কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। ফলে হ্রাস পাচ্ছে কৃষি জমি, ব্যাহত হচ্ছে কৃষি উৎপাদন।

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও মাটি বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও কাংখিত ফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের কৃষি নানাবিধ হুমকীর সম্মুখীন। বৈরী আবহাওয়া আমাদের কৃষিকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষি উৎপাদন। ফলে খাদ্য নিরাপত্তা হয় পরে অনিশ্চিত। প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করে ক্রম হ্রাসমান কৃষি আবাদী জমিতে বর্ধিষ্ণু জনগোষ্ঠির খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দেয়া দেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস। কৃষি ব্যবস্থায় বর্তমান প্রয়োগকৃত প্রযুক্তির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ অপরিহার্য। জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে অল্প জমিতে অধিক ফসলের চাষ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অপরিহার্য। তাই দেশের ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করে কৃষি ফসলের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতি ইঞ্চি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। সে লক্ষ্যে গ্রামীণ এলাকায় কৃষি জমিসহ বসতবাড়ীর অব্যবহৃিত জায়গা সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশের পল্লী এলাকার প্রায় ৮০ ভাগ ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন এবং ২০ ভাগ মাঝারী ও বড় কৃষকদের মোট ১ কোটি ৪৭ লক্ষ কৃষি পরিবারের প্রতিটি বসতবাড়িকে একটি উৎপাদনমূখী খামার ও বর্ধিত আয়ের উৎস হিসেবে পরিণত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

আমাদের দেশে প্রায় ৮০% লোক বিভিন্ন পর্যায়ে অপুষ্টিতে ভুগছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ সবচেয়ে বেশী অপুষ্টির স্বীকার। গ্রামীণ জনগোষ্ঠির অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা বসত বাড়ীতে সবজি চাষ করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা সহজেই পূরণ করা সম্ভব। এছাড়া গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন কর্মকান্ড যেমন মাছ চাষ, পশুপালন, মৌমাছি চাষ, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন করে নিজের পুষ্টির চাহিদা পুরণের পাশাপাশি স্বকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে অবদান রাখা সম্ভব। দেশের জনগনের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারের নানামূখী উদ্যোগ অব্যাহত আছে।

সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়নে দেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমুহ ফসলের উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। আর এসব উন্নত কৃষি প্রযুক্তি কৃষকের দোড় গোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ।

গ্রামীন এলাকায় কৃষি জমিতে চাষাবাদের পাশাপাশি বসতবাড়ীকে সুষ্ঠ ব্যবহার করে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পুরণের পাশাপাশি আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। গ্রামীন এলাকায় বসতবাড়ীকে “একটি বাড়ি একটি খামার” হিসেবে বিবেচনা করে নানাবিধ কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বসতবাড়ীর আকার ভেদে বিভিন্ন সবজি উৎপাদনসহ

স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের বিরাট জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা বিবেচনা রেখে একটি বাড়িকে একটি খামারে রূপান্তর করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গত ১৩-১৪ জুন ২০০৯ তারিখে সকল কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও কৃষি সম্প্রসারন বিভাগের অংশগ্রহনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় "একটি বাড়ি একটি খামার" সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি সমূহ উপস্থাপিত হয়।

এ বইয়ে "একটি বাড়ি একটি খামার" কর্মসূচী বাস্তবায়নে কৃষি গবেষণায় উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৃষি ও অকৃষি প্রযুক্তি সমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সমন্বিত ভাবে এ সব প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে ঈপ্সিত সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে। এ কারণে "দারিদ্র্য বিমোচনে একটি বাড়ি একটি খামার কৃষি প্রযুক্তি" মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচী বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। কৃষক নিজের পছন্দ, সার্মথ্য ও বাড়ির অবস্থান বিবেচনা করে সুবিধামত প্রযুক্তি নির্বাচন করে অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অংশগ্রহনে নিজের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা সহজেই পুরন করতে পারেন।

এ দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত মাঠ পর্যায়ের সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থার কর্মীগণের জন্য এক গুচ্ছ প্রযুক্তি (Packages of technology) হিসেবে বইটি বিকল্পহীন। সংকলিত বইটিতে প্রয়োগযোগ্য বিভিন্নমুখী প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ের সকল শ্রেনীর কর্মীদের বিজ্ঞান সম্মত সুপারিশমালা হিসেবে কাজ করবে। সে কারনে বইটিতে কৃষির বিভিন্ন উপখাতসহ (ফসল, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য সম্পদ) অন্যান্য বিষয় সমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে যা পূর্বে কোন বইয়ে সমন্বিতভাবে প্রকাশ করা হয়নি।

"দারিদ্র্য বিমোচনে একটি বাড়ি একটি খামার কৃষি প্রযুক্তি" বইটি কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষকদের মধ্যে সেতু বন্ধন আরো সুদৃঢ় করবে যা বাংলাদেশের কৃষিকে তথা কৃষক পরিবারের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে। উক্ত বইটিতে সংকলিত প্রযুক্তি সমূহ সম্প্রসারনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রায় ১.৪৭ কোটি কৃষক পরিবার উপকৃত হবে। বইটিতে সন্নিবেশিত প্রযুক্তি সমূহের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষকদের বসত বাড়িতে উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংসংস্থান, আয় বৃদ্ধি ও পুষ্টি ঘাটতি পূরণের একটি আদর্শ মডেল হিসাবে পরিণত হবে।

বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সরকারের অগ্রাধিকার কর্মকান্ডের মধ্যে অন্যতম। সরকরের এ কর্মকান্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত "একটি বাড়ি একটি খামার" কর্মসূচী বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ফসল উপখাত
বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ

বাংলাদেশে কৃষি জমির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এখন চাষাবাদের আওতায়ভূক্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। আর সে লক্ষ্যে বাড়তি ফসল উৎপাদনের জন্য হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি এবং শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। গ্রামাঞ্চলের বসতবাড়ীর এলাকায় অনেক জায়গার সুষ্ঠু/পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার হয় না বললেই চলে। কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক বসতবাড়ির আঙ্গিনায় যদি সুপরিকল্পিতভাবে শাক-সবজি ও ফলমূলের আবাদে ব্যবহার করা হয়, তাহলে খাদ্য ও পুষ্টির অভাব অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হবে। আমাদের খাদ্য তালিকায় বেশি স্থান জুড়ে আছে চাল বা দানাদার খাদ্য। আর সবজির পরিমাণ খুবই সামান্য। অথচ উন্নত দেশগুলোতে দানাদার খাবার ও শাকসবজির অনুপাত হচ্ছে ১ঃ২। পুষ্টির চাহিদা পূরনের জন্য প্রতিদিন আমাদের প্রচুর শাকসবজি গ্রহন করা দরকার। কিন্তু গড়ে মাথাপিছু দৈনিক শাক সবজির উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ৫৩ গ্রাম যা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে উৎপন্ন হয় ১৬৮ গ্রাম, অর্থাৎ আমাদের তুলনায় প্রায় ৩ গুণ বেশি।

বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির শতকরা পাঁচ ভাগের মত প্রায় দেড় কোটি বসতবাড়ির আওতায় রয়েছে। কিন্তু এ সব বসতবাড়ির আঙ্গিনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার হচ্ছে না। যার ফলে আমাদের দেশের বিশেষ করে গ্রাম বাংলার মানুষ, পরিকল্পিত আবাদের মাধ্যমে বাড়ির আঙ্গিনা থেকে যে বিপুল পরিমাণ শাক-সবজি এবং ফল-মূল উৎপাদন করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শাক-সবজি ও ফল-মূল থেকে যে সব পুষ্টি উপাদান অতি সহজে পাওয়া যায় তা বহু জটিল রোগকে প্রতিরোধ করে। প্রয়োজনীয় পরিমাণে শাক-সবজি না খাওয়ার কারণেই আমাদের দেশের জনগোষ্ঠির বিরাট অংশ চরম পুষ্টিহীনতায় ভুগছে এবং নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এ সব বসত বাড়ির আঙ্গিনার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা অনেকটাই পূরণ করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৯ (নয়) টি খামার বিন্যাস গবেষণা ও উন্নয়ন সাইটে বিভিন্ন শাক-সবজি মডেলের মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক সারা বছর শাক সবজি উৎপাদনের সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বসতবাড়ি এলাকায় মৎস্য চাষ, পশুপালনসহ অকৃষি প্রযুক্তির সুপারিশমালা বিদ্যমান রয়েছে। পরিবারের সকল সদস্যের শ্রম উৎপাদন কাজে ব্যবহার এবং মহিলা ও ছেলে মেয়েদের অবসর সময় সবজি চাষসহ অন্যান্য কাজে লাগিয়ে পারিবারিক শ্রমের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। এছাড়া পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি সবজি বিক্রি করে পরিবারের জন্য বাড়তি আয়ের সংস্থান করাও সম্ভব।

লক্ষ্য

প্রতিটি কৃষকের বাড়িকে পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য, পুষ্টি ও আয় বৃদ্ধিসহ পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জন করা।

উদ্দেশ্য

- বসতবাড়িতে পরিকল্পিত লাগসই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা।
- বসতবাড়িকে পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে সবজি, ফল-ফলাদি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- পরিবারের সকল সদস্যের শ্রম ও উৎপাদন কাজে লাগিয়ে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক পরিবারের আয় বৃদ্ধি করা।
- বসতবাড়ির বিদ্যমান সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণ করা।

বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষের সুবিধা

- অল্প পরিমাণ জমিতে অনেক প্রকার সবজি আবাদ করা যায়।
- অন্যান্য ফসলের তুলনায় সবজি আবাদে অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে এবং একই জমিতে বছরে কয়েকবার সবজি চাষ করা যায়।
- পুষ্টির বিবেচনায় প্রায় সকল শাক-সবজিতে উন্নত পুষ্টিমান বিদ্যমান থাকে, ফলে বছরব্যাপী উপযুক্ত পরিমাণ সবজি গ্রহনে পুষ্টিহীনতা দূর করে এবং রোগ মুক্ত থাকা সম্ভব।
- পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি সবজি বিক্রি করে পরিবারের জন্য বাড়তি আয়ের সংস্থান করা সম্ভব।
- বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পরিবারের মহিলা ও ছেলে-মেয়েদের অবসর সময় সবজি চাষ কাজে লাগিয়ে পারিবারিক শ্রমের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

ক) বসতবাড়িতে সবজি চাষ "গয়েশপুর মডেল" (এইজেড নং-১১, ১২ ও ২৮)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষের জন্য মডেল হিসেবে 'কালিকাপুর মডেল' প্রথম উদ্ভাবন করা হয়। পরবর্তীতে কালিকাপুর ফার্মিং সিস্টেম গবেষণা এলাকায় ১৯৯৭ সালে পাবনা জেলার সদর উপজেলার আওতাধীন গয়েশপুরে স্থানান্তর করা হয়। দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়ে একটি নতুন বসতবাড়ির মডেল উদ্ভাবন করা হয় যার নামকরণ করা হয় 'গয়েশপুর মডেল'। এ মডেলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সম্পূর্ণ বসতবাড়িটি ইউনিট হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং শাক-সবজি, ফল এবং কিছু মসলাজাতীয় ফসল আবাদ করা হয়। যাতে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা অনেকাংশে পুরণ হয়। সেই সাথে বাড়ির গৃহিনী এবং স্কুল পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরা অবসর সময় বসতবাড়িতে কাজ করে অবসর সময়টা কাজে লাগাতে পারে। বসতবাড়ির নিম্নে বর্ণিত ৯টি উৎপাদনযোগ্য স্থানে বছরব্যাপি বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি উৎপাদন (৭৪০ কেজি) করলে খাওয়া ও বিতরণ বাদে অতিরিক্ত সবজি বিক্রয় করে বছরে ৩৩৮০.০০ টাকার বেশি আয় করা সম্ভব।



চিত্র ঃ উন্মুক্ত জমিতে সবজি চাষ

বসতবাড়িতে সবজি চাষ "গয়েশপুর মডেল" সবজি নির্বাচন ও ফসল বিন্যাস

চাষের স্থান (উৎপাদন ইউনিট)		ফসল বিন্যাস		
		রবি	খরিপ-১	খরিপ-২
উন্মুক্ত জমি	বেড-১	মুলা (তাসাকিসান)	ডাঁটা শাক (লাবনী)	পুঁইশাক (চিত্রা)
	বেড-২	বাধাকপি (এটলাস-৭০)	বেগুন (স্থানীয় বর্ষপতি)	লাল শাক (বারি লালশাক-১)
	বেড-৩	টমেটো + পালংশাক (রতন + কুপি)	ঢেঁড়শ (বারি ঢেঁড়শ-১)	ডাঁটা শাক (লাবনী/স্থানীয়)
বেড়া		করলা (গজকরল্লা)	বরবটি (কেগর নাটকি)	করলা (গজকরল্লা)
ঘরের চাল		লাউ (দেশী + স্থানীয়)	চাল কুমড়া (স্থানীয়)	চাল কুমড়া (স্থানীয়)
মাচা		লাউ (স্থানীয়)	মিষ্টি কুমড়া (স্থানীয়)	লাউ (স্থানীয়)
অফলা গাছ	বেড-১	শিম (স্থানীয়)	চালকুমড়া (স্থানীয়)	চালকুমড়া (স্থানীয়)
	বেড-২	করলা (গজকরলা)	ঝিঙা (স্থানীয়)	ধুন্দুল (স্থানীয়)
	বেড-৩	চিচিংগা (স্থানীয়)	গাছ আলু (স্থানীয়)	গাছ আলু (স্থানীয়)
আংশিক ছায়াযুক্ত স্থান	বেড-১	ওলকচু (মাদ্রাজী)	ওলকচু (মাদ্রাজী)	ওলকচু (মাদ্রাজী)
	বেড-২	মৌলবীকচু (স্থানীয় কালো)	মৌলবীকচু (স্থানীয় কালো)	মৌলবীকচু (স্থানীয় কালো)
	বেড-৩	বহুবর্ষী মরিচ (স্থানীয়)	বহুবর্ষী মরিচ (স্থানীয়)	বহুবর্ষী মরিচ (স্থানীয়)
	বেড-৪	আদা (স্থানীয়)	আদা (স্থানীয়)	আদা (স্থানীয়)
	বেড-৫	হলুদ (সিন্দুরী)/বারি হলুদ-৩	হলুদ (সিন্দুরী)/বারি হলুদ-৩	হলুদ (সিন্দুরী)/বারি হলুদ-৩
ভেজা/স্যাঁতসেতে স্থান		পানি কচু (স্থানীয়/লতিরাজ)	পানি কচু (স্থানীয়/লতিরাজ)	পানি কচু (স্থানীয়/লতিরাজ)
বাড়ির সীমানা	বেড-১	পেঁপে (৩-৫টি) (স্থানীয়)	পেঁপে (৩-৫টি) (স্থানীয়)	পেঁপে (৩-৫টি) (স্থানীয়)
	বেড-২	লেবু (১-২টি) (বারমাসি)	লেবু (১-২টি) (বারমাসি)	লেবু (১-২টি) (বারমাসি)
	বেড-৩	পেয়ারা (১-২টি) (বারি পেয়ারা-৩)	পেয়ারা (১-২টি) (বারি পেয়ারা-৩)	পেয়ারা (১-২টি) (বারি পেয়ারা-৩)
বাড়ির পিছনের পরিত্যাক্ত স্থান	বেড-১	লাইজনা (স্থানীয় বারমাসি)	লাইজনা (স্থানীয় বারমাসি)	লাইজনা (স্থানীয় বারমাসি)
	বেড-২	কাঁচ কলা (স্থানীয়)	কাঁচ কলা (স্থানীয়)	কাঁচ কলা (স্থানীয়)



চিত্র ঃ বাড়ির আঙ্গিনায় লতিরাজ কচুর চাষ

খ) বসতবাড়িতে সবজি চাষ "সৈয়দপুর মডেল" (এইজেড নং- ২, ৩ ও ২৭)

গ্রামীণ মহিলাদের জন্য বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ একটি লাভজনক প্রযুক্তি। সঠিক ও নিয়মিত চাষ করা হলে কাংখিত ফল পাওয়া সম্ভব। এর ভিত্তিতে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, রংপুর খামার বিন্যাস গবেষণা ও উন্নয়ন সাইট কর্তৃক সৈয়দপুরে গবেষণা চালিয়ে বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ মডেল উদ্ভাবন করা হয়।

বসতবাড়িতে ফল/সবজি/মসলা জাতীয় ফসল বিন্যাস

চাষের স্থান (উৎপাদন ইউনিট)		ফসল বিন্যাস		
		রবি	খরিপ-১	খরিপ-২
উন্মুক্ত জমি	বেড-১	মুলা	লালশাক	গিমা কলমি
	বেড-২	বাঁধাকপি	ডাঁটা	ধনিয়া
	বেড-৩	বেগুন + লালশাক	পালংশাক	পুঁইশাক
	বেড-৪	টমেটো + লালশাক	ঢেঁড়স	লালশাক
	বেড-৫	রসুন	পাট শাক	ঢেঁড়স
ঘরের চাল		লাউ	মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া	-
মাচা		করল্লা/শিম	ঝিংগা	-
আংশিক ছায়াযুক্ত স্থান		আদা এবং হলুদ	আদা এবং হলুদ	আদা এবং হলুদ
স্যাঁতস্যাতে স্থান		কচু (লতিরাজ)	কচু (লতিরাজ)	কচু (লতিরাজ)
ঘরের পেছনে/পরিত্যাক্ত স্থান		পেঁয়ারা, সুপারী, কাঁঠাল আম এবং নারকেল	-	-
বাড়ির সীমানায়		পেঁপে	পেঁপে	পেঁপে
বেড়ায়		করল্লা/শিম	ধুন্দল	-
অফলা গাছ		চুপড়ী আলু	চুপড়ী আলু	গাছ আলু

গ) বসতবাড়িতে সবজি চাষ "বরেন্দ্র মডেল" (এইজেড নং- ৫, ৬, ২৬)

সবজি নির্বাচন ও ফসল বিন্যাস

বিভিন্ন ধরণের সবজি ফসলের চাহিদা ও বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্বাচন করতে হবে। বাড়ির আঙ্গিনার বিভিন্ন স্থানে চাষাবাদের উপযোগী সবজি ও এগুলোর বিন্যাস নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

বসতবাড়িতে ফল/সবজি/মসলা জাতীয় ফসল বিন্যাস

চাষের স্থান (উৎপাদন ইউনিট)		ফসল বিন্যাস		
		রবি	খরিপ-১	খরিপ-২
উন্মুক্ত জমি	বেড-১	লালশাক + বেগুন	গিমা কলমী	গিমা কলমী
	বেড-২	পালং শাক	পুঁই শাক	লালশাক
	বেড-৩	মুলা	কাটোয়া ডাঁটা	পিঁয়াজ/লালশাক
	বেড-৪	বাটি শাক	ঢেঁড়স + লালশাক	লালশাক
	বেড-৫	ঝাড় শিম	মরিচ + লালশাক	শাক মরিচ
ঘরের চাল		শিম/লাউ	মিষ্টি কুমড়া/চাল কুমড়া	লাউ
মাচা		শিম/লাউ	চাল কুমড়া	-
অফলা গাছ		শিম/লাউ	আলু গাছ	আলু
বেড়া/মাটির প্রাচীরে		শিম	ধুন্দল	-
আংশিক ছায়াযুক্ত স্থান		ওল	ওল	ওল
বসতবাড়ীর ফাঁকা স্থান		সাজনা	কাঁচা কলা, পেঁপে, সাজনা	-
পুকুর পাড়		শিম, টমেটো, পেঁপে, লালশাক	পুঁইশাক, করল্লা, ডাঁটা	-
কম্পোষ্ট চালা		চাল কুমড়া	-	-





চিত্র ঃ পুকুর পাড়ে মাচায় সবজি চাষ

ঘ) বসতবাড়িতে সবজি চাষ "আটকপালিয়া মডেল" (এইজেড নং- ১৭, ১৮,)

নোয়াখালী জেলার চর জব্বার এবং চর জুবলী চরাঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এসব এলাকায় রবি মৌসুমে লবনাক্ততার পরিমান ২-৮ ডিএস/মি। এই এলাকায় চাষীরা বছরব্যাপী সবজি উৎপাদন করে না বললেই চলে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, নোয়াখালী কর্তৃক উদ্ভাবিত আটকপালিয়া মডেল ব্যবহার করে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এই মডেলটি ব্যবহার করে চরাঞ্চলে বছরব্যাপী সবজি চাষ করে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে।

সবজি বিন্যাস ঃ সবজি বাগানের ৫টি বেড নিম্নের সবজি বিন্যাস অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে ঃ

বসতবাড়িতে ফল/সবজি/মসলা জাতীয় ফসল বিন্যাস

চাষের স্থান (উৎপাদন ইউনিট)		ফসল বিন্যাস		
		রবি	খরিপ-১	খরিপ-২
উন্মুক্ত জমি	বেড-১	লালশাক - মুলা-টমেটো	ডাঁটা	পুইশাক
	বেড-২	বাটিশাক - টমেটো	ঢেঁড়স	ডাঁটা
	বেড-৩	ফুলকপি	গিমাকলমি	গিমাকলমি
	বেড-৪	লালশাক + বেগুন	ঢেঁড়স	লালশাক
	বেড-৫	বাঁধাকপি - পালংশাক, মুলা - বাটিশাক	পুইশাক	ডাঁটা

মাচায় ঃ শিম, লাউ, ঝিঙ্গা, শশা, করল্লা; **ঘরের চালে ঃ** শিম, কুমড়া, লাউ (লতানো সবজি)

ঙ) বসতবাড়িতে সবজি চাষ "ফরিদপুর মডেল" (এইজেড নং- ১১, ১২)

ফরিদপুর এফএসআরডি এলাকায় বসতবাড়ির আঙ্গিনায় 'ফরিদপুর মডেল' নামে সবজি ফসল ধারা উদ্ভাবন করা হয়। চাষাবাদের উপযোগী সবজি ও তাদের বিন্যাস নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

চাষের স্থান (উৎপাদন ইউনিট)		ফসল বিন্যাস		
		রবি	খরিপ-১	খরিপ-২
উন্মুক্ত জমি	বেড-১	বাঁধাকপি	লালশাক	গিমা কলমি
	বেড-২	বেগুন	ঢেঁড়স	ঢেঁড়স
	বেড-৩	ফুলকপি	ডাঁটা	পুঁইশাক
	বেড-৪	আলু	ঢেঁড়স	ঢেঁড়স
	বেড-৫	বুশবীন	লালশাক	পুঁইশাক
	বেড-৬	টমেটো	ঢেঁড়স	লালশাক
	বেড-৭	মুলা	লালশাক	ডাঁটা
মাচা		শিম/লাউ	-	ধুন্দুল/শশা/চিচিঙ্গা
ঘরের চাল		শিম	চালকুমড়া	চাল কুমড়া
অফলা গাছ		গাছ আলু	গাছ আলু	গাছ আলু
ছায়াযুক্ত স্থান		হলুদ	হলুদ	হলুদ
স্যাঁতসেতে জায়গা		কচু (লতিরাজ)	-	-



চিত্র ঃ ছায়াযুক্ত স্থানে হলুদ চাষ

চ) বসতবাড়িতে সবজি চাষ “পালিমা মডেল” (এইজেড নং- ৮, ৯)

টাঙ্গাইল একটি বন্যাক্রান্ত এলাকা সে কারনে বসতবাড়ির ভিটা অন্য জাযগা থেকে মাটি এনে উচুঁ করে তৈরি করা হয় যা আকারেও ছোট হয়ে থাকে। পালিমা, টাঙ্গাইলে কয়েক বছর গবেষণা করার পর নিম্নে বর্নিত সবজি মডেলটি সুপারিশ করা হয়।

চাষের স্থান (উৎপাদন ইউনিট)		ফসল বিন্যাস		
		রবি	খরিপ-১	খরিপ-২
উন্মুক্ত স্থান	বেড-১	টমেটো/মুলা	ঢেঁড়স	পুঁইশাক
	বেড-২	বেগুন + লালশাক	ঢেঁড়স	পুঁইশাক + লালশাক
	বেড-৩	পালংশাক	গিমা কলমী	গিমা কলমী
	বেড-৪	ঝাড়সীম	ডাটা	পুঁইশাক
ঘরের চালা	চালা-১	বারি লাউ-১/স্থানীয় লাউ	চাল কুমড়া	চাল কুমড়া
	চালা-২	মিষ্টি কুমড়া	চাল কুমড়া	চাল কুমড়া
মাচা (বাঁশের তৈরি)	মাচা-১	বারি লাউ-১/স্থানীয় লাউ	চাল কুমড়া	ধুন্দল
	মাচা-২	বারি সীম-২/স্থানীয় সীম	করলা	চিচিংগা
	মাচা-৩	দেশী লাউ	মিষ্টি কুমড়া	চাল কুমড়া
মাচার নিচের জমি	শস্য বিন্যাস-১	আদা	আদা	আদা
	শস্য বিন্যাস-২	হলুদ	হলুদ	হলুদ
পুকুর পাড়	শস্য বিন্যাস-১	নেপিয়ার ঘাস	নেপিয়ার ঘাস	নেপিয়ার ঘাস
	শস্য বিন্যাস-২	লাউ	মাস কলাই	মাস কলাই
	শস্য বিন্যাস-৩	কচু	কচু	কচু
স্যাঁতসেতে জমি	শস্য বিন্যাস-১	লতিরাজ	লতিরাজ	লতিরাজ
গাছের ওপর	ক্রীপার-১	মেটে আলু	মেটে আলু	মেটে আলু
	ক্রীপার-২	মেটে আলু	মেটে আলু	মেটে আলু
	ক্রীপার-৩	-	ধুন্দল	ধুন্দল

প্রত্যেক বসতবাড়ির জমির পরিমাণ ও ধরণ অনুযায়ী উপরোক্ত সবজি বিন্যাসের আংশিক বা সবটুকু গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ছ) বসতবাড়িতে সবজি চাষ "নারিকেলি মডেল" (এইজেড নং- ৯, ১১)

জামালপুর জেলার নারিকেলি এলাকায় ফার্মিং সিস্টেম গবেষণা করে সারা বছরব্যাপি শাক-সবজি ও ফলমূল চাষের মডেল উদ্ভাবন করা হয়। এলাকার নাম অনুসারে মডেলটির নামকরণ করা হয়।

চাষের স্থান (উৎপাদন ইউনিট)		ফসল বিন্যাস		
		রবি	খরিপ-১	খরিপ-২
উন্মুক্ত জমি	বেড-১	টমেটো	পুঁইশাক	ডাঁটা
	বেড-২	লালশাক + বাঁধাকপি	কলমীশাক	-
	বেড-৩	ধনিয়া + পিঁয়াজ	ঢেঁড়স/প্রশস্ত পাতা ধনিয়া	-
	বেড-৪	পালংশাক + রসুন	বর্ষজীবি মরিচ	বর্ষজীব মরিচ
	বেড-৫	গাজর + করল্লা	কচু (লতিরাজ)	-
ঘরের চাল		চাল কুমড়া	লাউ	-
মাচা		লাউ/মিষ্টি কুমড়া	করল্লা/সীম	-
আংশিক ছায়াযুক্ত স্থান		আদা/হলুদ/মৌলভী কচু	আদা/হলুদ	আদা/হলুদ
স্যাঁতস্যাতে স্থান		কচু (লতিরাজ)	কচু (লতিরাজ)	কচু (লতিরাজ)
বাড়ির সীমানায়		পেঁপে/সাজনা/পেয়ারা	পেঁপে/সাজনা/পেয়ারা	পেঁপে/সাজনা/পেয়ারা
বেড়ায়		করল্লা/বরবটি	শশা	-

(জ) বসতবাড়িতে সবজি চাষ "লেবুখালী মডেল" (এইজেড নং- ১৩)

পটুয়াখালী জেলার লেবুখালীতে অবস্থিত ফার্মিং সিস্টেম গবেষণা এলাকায় এ সবজি উৎপাদন মডেলটি উদ্ভাবন করা হয়। পটুয়াখালী এলাকায় অধিকাংশ সময় জমি জোয়ারের পানিতে ডুবে থাকে। সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সবজির চাহিদা পূরণ ও পারিবারিক পুষ্টির উন্নয়নকল্পে এ মডেলটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

চাষের স্থান (উৎপাদন ইউনিট)		ফসল বিন্যাস		
		রবি	খরিপ-১	খরিপ-২
উন্মুক্ত জমি	বেড-১	টমেটো	ডাটা/ঝিংগা	পালংশাক
	বেড-২	আলু	পুঁইশাক	-
	বেড-৩	বেগুন	ডাটা	গিমা কলমী
	বেড-৪	মুলা + লালশাক	গিমা কলমী	-
	বেড-৫	বাঁধাকপি/পালংশাক	ঢেঁড়স	-

ঝ) বসতবাড়িতে সবজি চাষ "গোলাপগঞ্জ মডেল" (এইজেড নং- ২০)

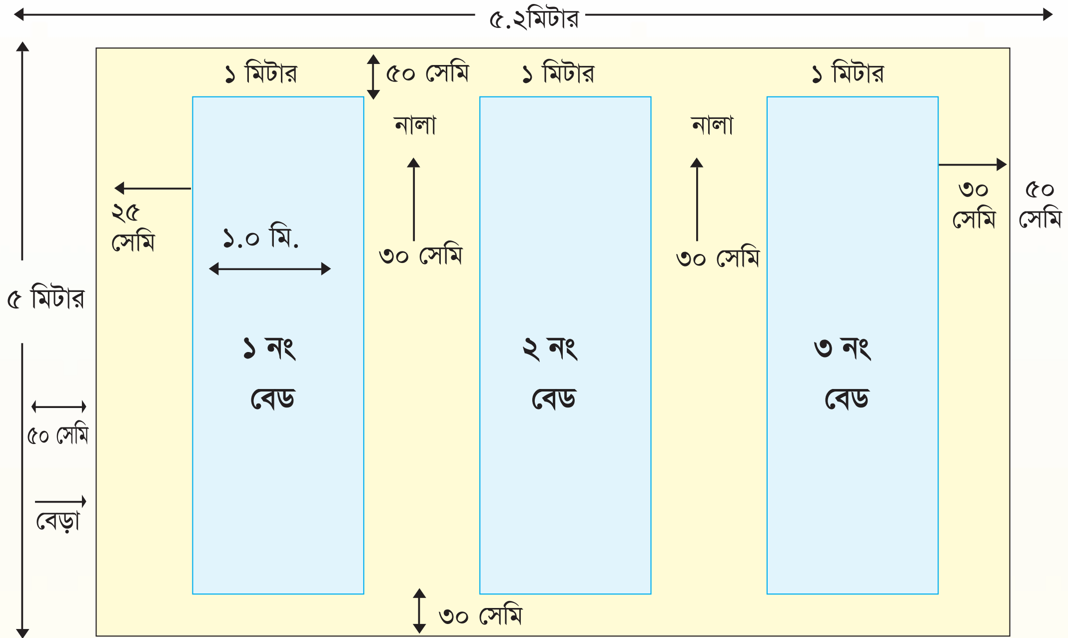
সিলেট এলাকায় সাধারনত বসতবাড়িতে শাকসবজির চাষ ও ফলমূলের গাছ রোপণ করে না ফলে অধিকাংশ বসতবাড়ি এলাকা পতিত থাকে। এ প্রেক্ষিতে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বিএআরআই গবেষণা করে গোলাপগঞ্জ এলাকায় বসতবাড়িতে শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন মডেলটি উদ্ভাবন করে যা 'গোলাপগঞ্জ মডেল' হিসেবে পরিচিতি পায়।

চাষের স্থান (উৎপাদন ইউনিট)		ফসল বিন্যাস		
		রবি	খরিপ-১	খরিপ-২
উন্মুক্ত জমি	বেড-১	মুলা + টমেটো	ডাঁটা	পুঁইশাক
	বেড-২	লালশাক + বাঁধাকপি	ডাঁটা	ঢেঁড়স
	বেড-৩	বেগুন + লালশাক	গিমা কলমি	-
	বেড-৪	ঝাড়শিম	লালশাক	বরবটি
(বেডের চারকোনায় বোম্বাই মরিচ রোপণ করা যেতে পারে)				
মাচা		শিম	চাল কুমড়া	-
মাচার নীচে		আদা/হলুদ	আদা/হলুদ	আদা/হলুদ
স্যাঁতস্যাতে স্থান		কচু (লতিরাজ)	কচু (লতিরাজ)	কচু (লতিরাজ)
বাড়ির সীমানায় (ঢালু এলাকার জন্য প্রযোজ্য)		আনারস/লেবু জাতীয়	আনারস/লেবু জাতীয়	আনারস/লেবু জাতীয়
অফলা গাছ		গোল মরিচ	চুপড়ি আলু	-

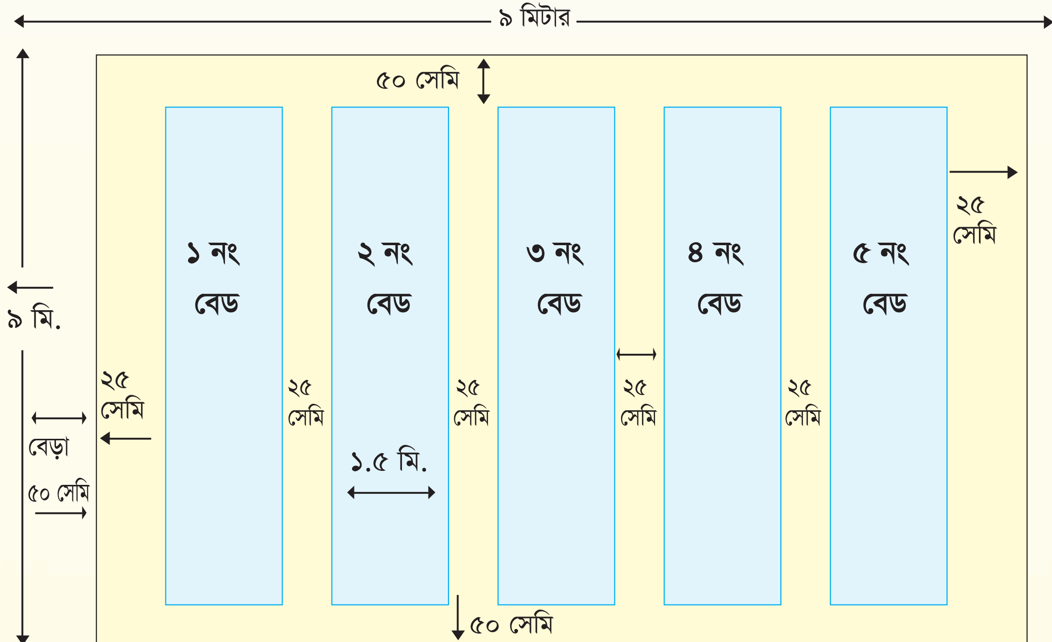
উল্লেখ্য প্রতিটি উৎপাদন ইউনিট এবং চাষাবাদযোগ্য শাকসবজি উৎপাদন প্রযুক্তির বিবরণ দেয়া হলো (গয়েশপুর মডেল অনুযায়ী)। বিভিন্ন এলাকার মডেলের সবজি ও প্রযুক্তির বিবরণ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা ভিন্নতর হবে।

(১) উন্মুক্ত স্থান

বসতবাড়ির অব্যবহৃত রৌদ্রোজ্জল উন্মুক্ত সুনিস্কাশিত উচুঁ জায়গা নিবিড় সবজি চাষ করার জন্য উপযোগী। উন্মুক্ত স্থান নির্বাচনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, বড় কোন গাছের ডাল এ জায়গায় ছায়া সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্য ডাল পালা ছেঁটে দিতে হবে। উন্মুক্ত স্থানের আকার ও পরিমাণ প্রাপ্ত স্থানের উপর নির্ভর করে ঠিক করে নিতে হবে। গয়েশপুর মডেলে সর্ব নিম্ন তিনটি বেড পাশাপাশি তৈরি করে সারা বছর সবজি চাষ করা হয়। প্রতিটি বেডের প্রস্থ ১ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৫ মিটার। বেডের দৈর্ঘ্য কৃষকের জমির পরিমানের উপর নির্ভর করে কম বেশি হতে পারে। দুই বেডের মধ্যবর্তী দুরত্ব হবে ৩০ সেমি। দুই বেডের মাঝখানের মাটি সমান ভাবে বেডে তুলে দিতে হবে ফলে বেডদ্বয়ের মাঝখানে নালা তৈরি হবে যা বর্ষাকালে পানি নিস্কাশনের জন্য ব্যবহৃত হবে। বেডের মাটি ভালো ভাবে কুপিয়ে ঝুরঝুর করতে হবে এবং নির্দিষ্ট বেডে সবজি বিন্যাস অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জৈব ও রাসায়নিক সার দিয়ে সবজির বীজ বা চারা লাগাতে হবে। গয়েশপুর মডেলে উন্মুক্ত স্থানে সবজি চাষে নিম্নরূপ সবজি বিন্যাস অনুসরণ করা হয় (নকশা নং-১)। এছাড়া রংপুর মডেলের উম্মুক্ত স্থানে সবজি চাষের ও নকসা দেয়া হলো (নকশা নং-২)।

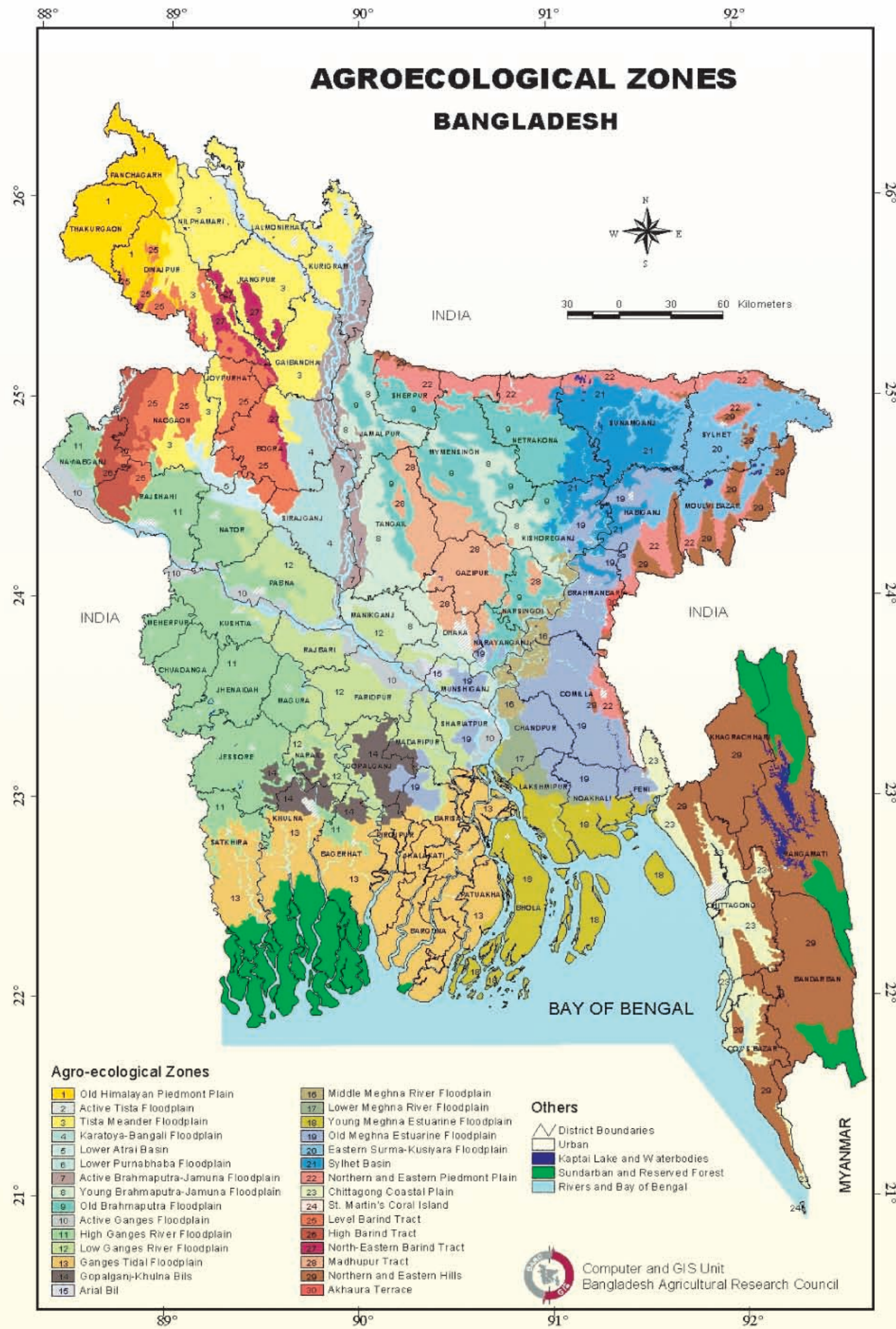


নকশা-১: বসতবাড়িতে সবজি বাগানের নকশা (গয়েশপুর মডেল)



নকশা-২: বসতবাড়িতে সবজি বাগানের নকশা (রংপুর মডেল)

মানচিত্র : কৃষি প্রাকৃতিক অঞ্চল (AEZ)



শাক-সবজি উৎপাদনের কলাকৌশল

(১) জমি তৈরি

বসতবাড়ির আংগিনার উন্মুক্ত স্থানে পাশাপাশি কমপক্ষে তিনটি বেড কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ভাল ভাবে তৈরি করতে হবে। দুই বেডের মাঝখানে ও তার পাশে নালা তৈরি করতে হবে এবং নালার মাটি বেডের উপরে উঠিয়ে দিতে হবে যাতে মূল জমি থেকে উঁচু হয়। বেডের মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ঝুরঝুরা এবং আগাছা পরিস্কার করে জমি তৈরি করতে হবে (বেড ১,২,৩)।

বেড-১

এই বেডের সবজি বিন্যাস হলো মুলা-ডাঁটাশাক-পুঁইশাক। মুলার বীজ কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহের (মধ্যে অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর) মধ্যে বপন করতে হবে। মুলা শেষ হওয়ার ৭-১০ দিনের পরই ডাঁটা শাকের বীজ বপন করতে হবে। ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহে (মধ্য মার্চ) ডাঁটা বপন করতে হবে। ডাঁটা শাক শেষ হওয়ার পর পরই জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি (মে মাসের শেষে) পুঁই শাকের বীজ বপন করতে হবে।

বেড-২

এই বেডের সবজি বিন্যাস হলো বাঁধাকপি-বেগুন-লালশাক। প্রথমে বাঁধাকপি চারা করার জন্য আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহে বীজ তলায় বীজ ফেলতে হবে। চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হলে মধ্য কার্তিকে (নভেম্বর এর ১ম সপ্তাহে) মুল বেডে চারা রোপন করতে হবে। বাঁধাকপি শেষবার সংগ্রহের আগেই বেগুনের চারার জন্য অন্য জমিতে বীজ তলায় বীজ বুনতে হবে। চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হলেই মুল বেডে ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহে (মধ্য ফেব্রুয়ারী) চারা রোপন করতে হবে। বেগুন শেষ হওয়ার পর পরই মধ্য শ্রাবণ থেকে মধ্য ভাদ্রের মধ্যে (আগষ্ট মাস) লালশাকের বীজ সরাসরি বেডে সারি/ছিটিয়ে বপন করতে হবে।

বেড-৩

এই বেডের সবজি বিন্যাস হলো টমেটো+পালংশাক-ঢেঁড়শ-ডাঁটা শাক। টমেটোর চারা করার জন্য মধ্য সেপ্টেম্বরের মধ্যে বীজ তলায় বীজ বপন করতে হবে। চারার বয়স ২৫-৩০ দিন হলে লাইন করে টমেটোর চারা ও পালং এর বীজ একসাথে রোপন/বপন করতে হবে। বেগুন শেষ হওয়ার পরপরই শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে ডাঁটাশাকের বীজ সরাসরি বেডে সারি/ছিটিয়ে বপন করতে হবে।




চিত্র ঃ উন্মুক্ত রৌদ্রজ্জল স্থানে সবজি চাষ

সার প্রয়োগ

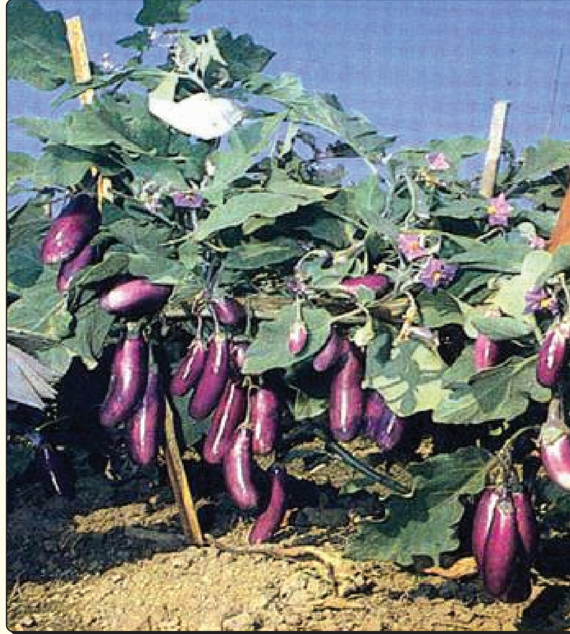
ফসল অনুযায়ী নির্দিষ্ট পারিমাণ গোবর সার, টিএসপি, এমপি সার পূর্নমাত্রায় এবং ইউরিয়া সারের একাংশ শেষ চাষের সময় জমিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ হিসাবে ২/৩ বারে দিতে হবে (সারণী-২)।

বীজ বপন

অধিকাংশ সবজির বীজ সরাসরি বেডে বোনা যায়। সারিতে বীজ বপন করলে আন্তঃপরিচর্যা করতে সুবিধা এবং ফলনও ভাল পাওয়া যায়। যে সমস্ত শাকের বীজ অতি ক্ষুদ্র (যেমন লালশাক, ডাটাশাক) এবং পরিমানেও অল্প লাগে, এ সমস্ত বীজ বোনার সময় বালি বা ছাই এর সাথে ভালভাবে মিশিয়ে সমান ভাবে বেডে ফেলতে হয়। পালং এর বীজ বোনার আগে দুইদিন পানিতে ভিজিয়ে পরে রোদে শুকিয়ে গজিয়ে বেডে সারি করে বা ছিটিয়ে বুনতে হয়। পালং ও টমেটোর বীজ/চারা একই দিনে লাগাতে হয়। ঢেঁড়সের বীজ সারি থেকে সারি ৬০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছ ৫০ সেমি দূরে প্রতি গর্তে দু'টি করে বীজ বুনতে হবে। পরে প্রতি গর্তে একটি করে চারা রাখতে হবে। মুলা সারি (৩০ সেমি × ২০ সেমি) করে বুনতে হবে। অথবা বোনার সময় সারি ঠিক রেখে একটু ঘন করে বীজ বুনলে ছোট অবস্থান কচি শাক খেয়ে ২০ সেমি দুরে দুরে একটি গাছ রাখলে বড় বড় মুলা পাওয়া সম্ভব। পুঁই শাক এর বীজ সারি (৩০ সেমি × ৪৫ সেমি) করে সরাসরি বপন করা যায় অথবা চারা করে নিয়েও সারিতে রোপন করা যায়।

চারা রোপন

টমেটো, বেগুন ও বাঁধাকপির সবজিগুলির চারা মুল বেডে রোপনের আগে অন্য জায়গায় চারা করে নিতে হয়। চারা লাগানোর পূর্বে জমি ভালভাবে তৈরি করে সারিতে নির্দিষ্ট দুরত্বে টমেটো (৭৫ সেমি × ৫০ সেমি) বাঁধাকপি (৬০ সেমি × ৪৫ সেমি) এবং বেগুন (৭৫ সেমি × ৫০ সেমি) ছোট গর্ত করে পর্যাপ্ত জৈব সার দিয়ে একটি করে চারা লাগাতে হবে।



চিত্র ঃ বসতবাড়িতে উত্তরা জাতের বেগুন চাষ

পানি সেচ ও নিকাশ

বীজ বোনা ও চারা লাগানোর পর বেডে ভালভাবে পানি সেচ দিতে হবে। সেচের সময় লক্ষ্য রাখতে কোন ভাবেই যেন চারা নষ্ট না হয়। এ জন্য অতি সূক্ষ ছিদ্রওয়ালা ঝাঁঝারী দিয়ে সেচ দিলে ভাল হয়। সেচের কাজ সাধারণত সকাল অথবা বিকেল বেলা করা ভাল। দুই একবার সেচ দেয়ার পর মাটি শক্ত হয়ে স্তর বেধে গেলে কাঠি বা নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে। বৃষ্টি বা অতিরিক্ত সেচের পানি যেন সহজেই নিস্কাশিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আগাছা দমন ও অন্যান্য পরিচর্যা

প্রতিটি ফসলের জমি নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিস্কার ও মাটি আলগা করে দিতে হবে। মাটিতে জোঁ থাকা অবস্থায় নিড়ানী দিলে অনেক দিন ধরে মাটিতে রস থাকে। সবজি বাগান ও এর চার পাশে সব সময়ই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে করে রোগ ও পোকা বাসা বাঁধতে না পারে। কোন অবস্থায়ই সবজি বাগানে ছায়া না পড়ে সেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(২) বেড়া

উন্মুক্ত স্থানের বেডের সবজি গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগীর হাত হতে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বেড়া বাঁশের কুঞ্চি, গাছের ডালপালা অথবা বাজারের কম দামের নাইলনের নেট ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা যায়। এই বেড়ার ভিতরে চতুর পার্শ্বে প্রতি ২ মিটার অন্তর অন্তর মাদা তৈরি করতে হবে যাতে বর্ষাকালে পানি না জমে। মাদাতে নির্দিষ্ট ফসল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জৈব ও রাসায়নিক সার (সারণী-২) দিয়ে বীজ বা চারা রোপন করতে হবে। পরবর্তীতে ইউরিয়া ও এমপি সার ৩ বারে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। বেড়াতে করলা ও বরবটি সাফল্যজনক ভাবে চাষ করা যায়। রবি মৌসুমে করলা কার্তিকের ১ম সপ্তাহে বপন/রোপন করা হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে করলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে পুরাতন মাদার পাশে নতুন মাদায় বরবটির বীজ বপন করতে হবে। বরবটি খরিপ-২ এর শেষ হওয়ার পর শ্রাবণের ১ম দিকে (মধ্য জুলাই) পুনরায় গজকরলার বীজ বপন করতে হবে। করলা সারা বছরই চাষ করা যায়। উল্লেখ্য বেড়ার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হলে একটি ফসল শেষ হওয়ার এক মাস আগে পুরাতন মাদা থেকে একটু দুরে নতুন মাদা তৈরি করে পরবর্তী ফসলের বীজ বপন করতে হবে। এ স্থান থেকে বছরে ৩০-৩৫ কেজি সবজি উৎপাদন করা যায়। এ ছাড়া বাড়ির অন্যান্য বেড়া থেকেও অনুরুপ ভাবে সবজি উৎপাদন করা সম্ভব।





চিত্র ঃ বেড়ায় সবজি চাষ

(৩) ঘরের চালা

বসতবাড়িতে বিভিন্ন প্রকার ঘর থাকে যেমন-থাকার ঘর, রান্না ঘর, গোয়াল ঘর ইত্যাদি। এ সমস্ত ঘরের চাল সবজি চাষের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘরের পার্শ্বে এমন ভাবে মাদা তৈরি করতে হবে যা ঘরের ভিটি হতে ১-১.৫ মিটার দুরে থাকে। মাদা যতটা সম্ভব বড় গভীর (১ মিঃ দৈর্ঘ্য × ১ মিঃ প্রস্থ × ১ মিঃ গভীর) উঁচু করতে হবে যাতে মাদায় বর্ষাকালে পানি জমতে না পারে। মাদা বড় করলে শিকরের ব্যাপক বিস্তার সহজতর হবে, গাছ প্রচুর খাদ্য উপাদান সহজে নিতে পারে ও প্রচুর ফল দিতে পারে। বিভিন্ন জৈব ও প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার (সারণী-২) মিশ্রিত করে ৭-১০ দিন ঢেকে রাখতে হবে। প্রতি মাদাতে ৩/৪ টা করে বীজ বপন করতে হবে। পরবর্তী সময়ে প্রতি মাদাতে ১-২ টা সুস্থ সবল চারা রেখে বাকী চারা তুলে ফেলতে হবে। চারা গাছকে লম্বা কোন বাউনির সাহায্যে চালায় তুলে দিতে হবে। চালা যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য ছোট গাছের ডাল বা পাট খড়ি দিয়ে হালকা চালের উপর বাহন তৈরি করে দিতে হবে। এতে এক দিকে যেমন কোন অতিরিক্ত জায়গা বা মাচার দরকার হয় না, অন্যদিকে ঘর ঠান্ডা থাকে এবং সেই সঙ্গে বাড়তি সবজিও পাওয়া যায়। লাউ, দেশী শিম, চাল কুমড়া/মিষ্টি কুমড়া খুব সহজেই ঘরের চালে চাষ করা যায়। উল্লেখ্য লাউ এর বীজ/চারা মধ্য শ্রাবণে (আগষ্টের ১ম সপ্তাহ) বপন/রোপন করা হয়। লাউ শেষ হলে ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহে (মধ্য ফেব্রুয়ারী) চালকুমড়ার বীজ/চারা বপন/রোপন করতে হবে। ঘরের চালা সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হলে একটি ফসল শেষ হওয়ার এক মাস আগে পুরাতন মাদা থেকে একটু দুরে নতুন মাদা তৈরি করে পরবর্তী ফসলের বীজ বপন করতে হবে। ঘরের চালার সংখ্যার তারতম্য অনুযায়ী সারা বছর চালা থেকে ১০০-১৫০ কেজি সবজি উৎপাদন করা সম্ভব।



চিত্র ঃ ঘরের চালে সবজি চাষ



চিত্র ঃ ঘরের চালে সবজি চাষ

(৪) মাচা



চিত্র ঃ মাচায় সবজি চাষ

ঘরের আশে পাশের ফাঁকা জায়গা ও পুকুর পাড় যেখানে পর্যাপ্ত রৌদ্র পড়ে এমন জায়গায় বাঁশ, পাট খড়ি ও জি আই তার দিয়ে মাঁচা তৈরি করা যেতে পারে। মাচার নীচে বা পার্শ্বে যতটা সম্ভব বড় ও গভীর করে মাদা (দৈর্ঘ্য ১ মিঃ × প্রস্থ ১ মিঃ × গভীর ১ মিঃ) তৈরি করতে হবে, যাতে করে মুলের বিস্তার সহজতর হয়, গাছ প্রচুর খাদ্য উপাদান সহজেই নিতে পারে এবং অধিক ফলন পাওয়া যায়। মাদা তৈরি ও প্রস্তুত করণের অন্যান্য কৌশল উপরে বর্ণনাতে দেয়া হয়েছে। দেশি শিম, কুমড়া জাতীয় সবজি সারা বছরই মাঁচাতে চাষ করা যায়। উল্লেখ্য, সাধারণতঃ লাউ, মিষ্টি কুমড়া সবজি বিন্যাস করতে কৃষকরা পছন্দ করে। লাউ এর বীজ/চারা মধ্য শ্রাবণ (আগষ্ট ১ম সপ্তাহে) বপন/রোপন করলে আগাম ফলন পাওয়া যায়। লাউ এর পর ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহে (মধ্য ফেব্রুয়ারী) মিষ্টি কুমড়ার বীজ/চারা বপন/রোপন করতে হয়। মাচার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হলে একটি ফসল শেষ হওয়ার এক মাস আগে পুরাতন মাদা থেকে একটু দুরে নতুন মাদা তৈরি করে পরবর্তী ফসলের বীজ বপন করতে হবে মাচা থেকে ১৫০-২০০ কেজি সবজি উৎপাদন করা যায়।



চিত্র ঃ মাচায় লাউ চাষ

(৫) অফলা গাছ

বসতবাড়িতে বিদ্যমান বিভিন্ন অফলা গাছ যেমন জিগা, বাবলা, মাদার ইত্যাদি গাছের গোড়া হতে ১ মিটার দুরে পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে মাদা তৈরি করে অফলা গাছকে বাউনি্ হিসাবে ব্যবহার করে মৌসুম ভেদে বিভিন্ন সবজি যেমন - গাছ আলু, শিম, ধুন্দুল, ইত্যাদি চাষ করা যায়। অফলা গাছে শিম -ঝিংগা, দেশি শিম-ধুন্দল অথবা চুপরী আলু-চিচিংগা ইত্যাদি ফসল বিন্যাস অনুযায়ী চাষ করা যায়। দেশি শিম (মধ্য আগষ্ট) ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে মাদা তৈরি করে চারা/বীজ লাগাতে হয়। দেশি শিম শেষ হলে ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে (মধ্য ফেব্রুয়ারী) নতুন করে মাদা তৈরি করে মাদায় ঝিংগা লাগাতে হবে। বাড়ীতে একাধিক অফলা গাছ থাকলে সেই গাছে একই ভাবে একই সময়ে দেশি শিম ও ধন্দুলের চাষ করতে হবে। গাছ আলু চাষ করতে হলে ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে মাদা তৈরি করে প্রতি মাদায় একটি করে গজানো আলু রোপন করতে হবে। সবজি গাছ একটু বড় হলে বাউনির সাহায্যে মূল গাছে উঠিয়ে দিতে হবে। অফলা গাছ যদি অধিক শাখা প্রশাখা ও পাতাযুক্ত হয় এবং বেশি ছায়ার সৃষ্টি করে সে ক্ষেত্রে ছাটাই করে পাতলা করে রৌদ্রের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছ প্রতি সারা বছর ৩০-৪০ কেজি সবজি উৎপাদন করা যায়।





চিত্র ঃ অফলা গাছে সবজি চাষ

(৬) আংশিক ছায়াযুক্ত স্থান

সাধারণতঃ বড় গাছের নীচে বা ঘরের পিছনে যেখানে ভালভাবে সূর্যের পূর্ণ আলো পৌঁছায় না সেখানেও সফল ভাবে বিভিন্ন প্রকার ছায়া সহনশীল সবজি ও মসলা জাতীয় ফসল যেমন-ওল কচু, মৌলবী কচু, মানকচু, আদা, হলুদ ও বহুবর্ষী মরিচ ইত্যাদি উৎপাদন করা যায়। উক্ত জমি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে জৈব ও প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার যোগ করে জমি প্রস্তুত করতে হবে এবং ৩০-৪০ সেমি দুরে চারা বা কন্দ লাগাতে হবে। বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে (মধ্য এপ্রিল) ভাল ভাবে জমি তৈরি করে ওলকচু, মৌলবী কচু, আদা, হলুদ বহুবর্ষী মরিচের চারা বীজ বপন করতে হবে। এতে করে একদিকে যেমন বাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে অপর দিকে অর্থনৈতিক ভাবেও লাভবান হওয়া যায়। স্থানভেদে আংশিক ছায়াযুক্ত স্থান থেকে ৫০-৭০ কেজি সবজি উৎপাদন করা যায়।





চিত্র ঃ আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে সবজি চাষ

(৭) ভেজা/স্যাঁতসেতে স্থান

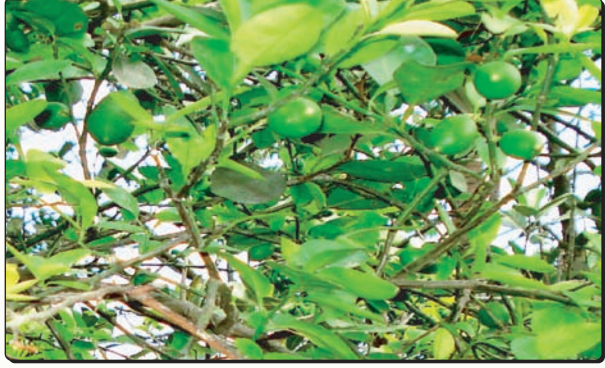
নলকুপ বা কুয়ার পানি ব্যবহারের ফলে ঐ পানি যে নীচু জায়গায় গিয়ে জমা হয় সে সব স্থান সব সময় ভেজা ও স্যাতসেতে থাকে। এসব স্থানে সাধারণতঃ তেমন কোন সবজি চাষ করা হয় না। অথচ এ স্থানেও কোন না কোন সবজি চাষ করা যায় যেমন- পানিকচু/লতি কচু। এ সব কচু জাতীয় গাছ ৬০ সেমি × ৩০ সেমি দুরে দুরে লাগানো হয় ও অল্প যত্নেই ভাল ফলন পাওয়া যায়। বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে (মধ্য এপ্রিল) কচুর কন্দ লাগাতে হবে। এ ধরনের চাষ থেকে প্রতি শতাংশে ৮০-১০০ কেজি সবজি উৎপাদন করা যায়।



চিত্র ঃ স্যাঁতসেতে স্থানে কচু চাষ

(৮) বাড়ির সীমানা

বাড়ির চারদিকে সীমানা বরাবর কিছু কিছু সবজি ও স্বল্প মেয়াদী ফল গাছ লাগিয়ে অনায়াসেই দীর্ঘ দিন সবজি ও ফল উৎপাদন করা যায়। যেমন - পেঁপে, লেবু, পেয়ারা, কুলবড়ই ইত্যাদি। সাধারণতঃ এ ধরনের গাছ লাগানোর জন্য বড় আকারের মাদা (দৈর্ঘ্য ১ মিঃ × প্রস্থ ১ মিঃ × গভীর ১ মিঃ) তৈরি করে এতে পঁচা গোবর, বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা ও সারণী-২ এ বর্ণিত সারের মাত্রা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর মাদা ভালো ভাবে কুপিয়ে চারা লাগাতে হবে। এ ধরনের গাছ বর্ষাকালের শুরুতে (মধ্য মে-জুন) লাগানোই ভালো। নতুন অথবা বসতবাড়িতে বিদ্যমান এ সমস্ত গাছে বছরে কমপক্ষে দুইবার সার প্রয়োগ ও পানি ব্যবস্থাপনা করতে হয়। সার ও পানি সাধারণতঃ ফল শেষ হওয়ার পরপরই একবার এবং বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার পর আরেকবার ব্যবস্থাপনা করতে হয়। এ জায়গা থেকে গাছ প্রতি ৪০-৬০ কেজি পেঁপে বা পেয়ারা উৎপাদন করা সম্ভব।



চিত্র ঃ বাড়ির সীমানায় লেবু চাষ





চিত্র ঃ বাড়ির সীমানায় পেঁপে ও পেয়ারা চাষ

(৯) বাড়ির পিছনের পরিত্যক্ত জমি

সাধারণতঃ প্রত্যেক বাড়ির পিছনে কিছু পরিত্যাক্ত জায়গা থাকে যা কোন কাজে ব্যবহার করা হয় না। এ ধরনের জায়গায় বড় আকারের সবজি গাছ লাগিয়ে তা থেকে প্রতি মৌসুমেই কিছু বাড়তি সবজি পাওয়া যেতে পারে। যেমন-সজিনা, লাইজনা, কাঁচকলা ইত্যাদি। সাধারণতঃ এ ধরনের গাছ লাগানোর জন্য বড় আকারের মাদা (দৈর্ঘ্য ১ মিঃ × প্রস্থ ১ মিঃ × গভীর ১ মিঃ) তৈরি করে এতে পঁচা গোবর, বিভিন্ন ময়লা আবর্জনা ও তালিকা-২ এ বর্ণিত সারের মাত্রা অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর মাদা ভালো ভাবে কুপিয়ে চারা লাগাতে হবে। সাধারণতঃ বৈশাখ এর শুরুতে (এপ্রিল-মে) গাছ লাগানো ভাল। উপরের বর্ণনা মতে বছরে দুইবার সঠিক পরিচর্যা করলে গাছ প্রতি ২য় বছর থেকে ২০০-২৫০ টাকার সবজি পাওয়া যায়।





চিত্র ঃ বাড়ির পিছনের পরিত্যক্ত জমিতে কাঁচকলা ও সজিনা চাষ

পোকা মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

সবজি বাগানে যে সমস্ত পোকা মাকড় আক্রমন করে এদের মধ্যে (১) বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা (২) কুমড়া জাতীয় ফলের মাছি পোকা ও লাল পাম্পকিন বিটল (৩) কুমড়া জাতীয় সবজি, বেগুন ও শিমের কাঁঠালী পোকা এবং (৪) টমেটো, বাঁধাকপি, বেগুন শিম ও কুমড়া জাতীয় সবজির জাবপোকা ও লেদাপোকা প্রধান। বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা কচি কান্ড, কচি ডগা ও ফল ছিদ্র করে ডগা ও ফলের বিশেষ ক্ষতি করে। যদি কার্যকর দমন পদ্ধতি সঠিক সময়ে প্রয়োগ করা না হয় তাতে প্রায় শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ পর্যন্ত বেগুন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কুমড়া জাতীয় ফলের মাছি পোকার পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী পোকা কচি ফলে ডিম পাড়ে। এদের আক্রমনের ফলে প্রায় ৭০ ভাগ পর্যন্ত ফল নষ্ট হয়ে যায় যা কীটনাশক প্রয়োগ করেও ভাল ভাবে দমন করা যায় না। ডিম ফুটে কীড়া বের হয়ে তা ফলের ভিতরে অংশ খেয়ে ফেলে। আক্রান্ত ফল হলুদ হয়ে পঁচে যায়। লাল পাম্পকিন বিটল ও কাঁঠালী পোকা সবজি গাছের নরম অংশ খেয়ে গাছের ক্ষতি করে। জাব পোকা গাছের কচি পাতা, কান্ড ও ফলের রস চুষে খায় এবং লেদা পোকা গাছের পুরো বা আংশিক পাতা খেয়ে সবজির ক্ষতি করে। বসতবাড়ির সবজি বাগানে পোকা মাকড়ের দমনের জন্য যতটা সম্ভব কীটনাশক প্রয়োগ না করা ভাল। তাই আক্রমণের শুরুতে পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলে, আক্রান্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে ফেলে ও বিষটোপ ফাঁদ ব্যবহার করে সহজেই পোকা দমন করা যায়। **কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করলে সাতদিন পর্যন্ত বাগান থেকে সবজি সংগ্রহ, বিক্রয় ও খাওয়া উচিত নয়।** পোকা মাকড়ের দমন পদ্ধতি সারণী-৩ এ দেয়া হলো।

রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা

সবজিতে যে সমস্ত রোগ বালাই হয় এদের মধ্যে (১) টমেটো ও বেগুনের ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট (২) টমেটো ও শিম এর ভাইরাস রোগ (৩) শিকড় ও ডগা পঁচা রোগ (৪) টমেটো ও আলুর আগাম ও নাবী ধ্বসা রোগ (৫) শিম বরবটি ও পুঁইশাক এর পাতায় দাগ রোগ প্রধান। টমেটো ও বেগুন গাছের যে কোন বয়সেই ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট দেখা দিতে পারে। বন্য বেগুন বা তিত বেগুন এর উপর বেগুন বা টমেটোর জোড়কলম করে এই রোগ থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। টমেটো ও শিম ভাইরাস রোগ বেশ ক্ষতি করে থাকে। তাই এ রোগের বাহক মাছি পোকা দমনই হচ্ছে এ রোগ দমনের উত্তম পন্থা। শিকড় ও গোড়া পঁচা রোগ সাধারণতঃ স্যাঁতসেতে স্থানে বেশি দেখা যায়। তাই সবজির পিট বা মাঁদা উঁচু ও শুস্ক জায়গায় করা উত্তম। শিম, বরবটি ও পুঁইশাক এর পাতায় দাগ রোগ তেমন ক্ষতিকর নয় তবে এর ফলে গাছের উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় ও উৎপাদিত সবজি বাজার মূল্য কম হয়। এনথ্রাকনোজ রোগে পাতা ও কান্ডে ধুসর বাদামী, কালো কিংবা ঝলসানো দাগ পড়ে। রোগ বালাই দমনের ক্ষেত্রে রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহারের চেয়ে বাগান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, রোগ দেখা মাত্র আক্রান্ত অংশ বা সম্পূর্ণ গাছ তুলে ফেলে দেয়া ইত্যাদি বেশি কার্যকরী। বিভিন্ন রোগের দমন ব্যবস্থা সারণী-৪ এ দেয়া হলো।

সারণী-১ ঃ সবজি বিন্যাসের সংক্ষিপ্ত প্রযুক্তি বিবরণী (প্রতি শতাংশে বা ৪০ বর্গমিটারে)

সবজির নাম	সুপারিশকৃত জাত	বপন/রোপন কাল (উপযুক্ত সময়সহ)	বীজের পরিমাণ (গ্রাম/সংখ্যা)	বপন/রোপন দুরত্ব (সেমি)	ফসল সংগ্রহের কাল (দিন)	গড় ফলন (কেজি)
মুলা	তাসাকিসান	১৫ সেপ্টে-৩০ নভে (১ অক্টোবর)	১০-১২ গ্রাম	৩০×১৫ আগাম ৩০×২০ স্বাভাবিক	৫০-৭০	৩০০
টমেটো	রতন	১ সেপ্টে -১৫ অক্টো (১৫ সেপ্টে)	০.৬ (প্রতি বর্গমিটার বীজ তলায় ৩ গ্রাম বীজ)	৭৫×৫০	৮০-১২৫	২০০-২৫০
বেগুন	স্থানীয় বর্ষপতি	ফেব্রুয়ারী-খরিপ	০.৬ (প্রতি বর্গমিটার বীজ তলায় ৫ গ্রাম বীজ)	৭৫×৫০	৬০-৯০ (জাত ভেদে) ৪/৫ মাস পর্যন্ত	২০০
বাঁধাকপি	এটলাস ৭০	১৫ জুলাই-৩০ অক্টো (১ সেপ্টেম্বর)	১.৫ গ্রাম (প্রতি বর্গ মিটার বীজ তলায় ৫ গ্রাম বীজ)	৬০×৪৫	৯০-১২০ (জাত ভেদে)	৩০০-৪০০
লাউ	বারি লাউ-১ স্থানীয়	জুলাই ১৫-অক্টো ৩১ (সেপ্টেম্বর ১৫)	১.৫ গ্রাম (৫টি/মাদা)	৩০০×৩০০	৬০-১৫০	২০০
করলা	গজ করলা	সারা বছর (মার্চ)	২৫ গ্রাম (৫টি/মাদা)	বেড়ায় ১ মিটার পর পর	৫০-১১০	৬০
পালং শাক	কুপি পালং	সেপ্টেম্বর-জানুয়ারী (অক্টোবর)	১৫০ গ্রাম	২৫×ক্রমাগত	৪০-৭০	৪০
চালকুমড়া ও মিষ্টিকুমড়া	স্থানীয়	সারা বছর (মার্চ-এপ্রিল)	১.২-১.৪ গ্রাম (৫টি/মাদা)	২৫০×২৫০	৬০-১৪০	৫০-৮০
লাল শাক	আলতা পাতী	সারা বছর (মে)	৪-৫ গ্রাম	২০×ক্রমাগত	৩৫-৫৫	২৫
ডাটা শাক	লাবনী	সারা বছর (মে)	৬-৮ গ্রাম	২৫× ক্রমাগত	৪০-৫৫	১৫০
ধন্দুল	স্থানীয়	মার্চ-জুন (এপ্রিল)	৮ গ্রাম (৫টি/মাদা)	১৫০×১৫০	৬০-১৮০	৪০
ঝিংগা/চিচিংগা	স্থানীয়	মার্চ-জুন (এপ্রিল)	৮ গ্রাম (৫টি/মাদা)	১৫০×১৫০	৬০-১৬০	৪০
শিম	বারি শিম-১/ স্থানীয়	১ জুলাই-সেপ্টেম্বর ১০ (আগষ্ট)	২০ গ্রাম (৫টি/মাদা)	২০০০×২০০	৬০-১৩০	৮০
পুঁইশাক	চিত্রা	এপ্রিল-মে	১০ গ্রাম (প্রতি লাইনে)	৩০×৪৫	৫০-১৫০	২৫০
ঢেঁড়স	বারি ঢেঁড়স	১ ফেঃ-৩১ মে (১ সেঃ -৩০ অক্টোঃ)	২৫ গ্রাম	৬০×৫০	১২০	৬০
বরবটি	কেগর নাটকি	বর্ষা ও বেশী শীত বাদে সারা বছর (মে)	৮০ গ্রাম	৬০×২৫	৪০-৯০	৬০
মরিচ	বারমাসি	বর্ষা ও বেশী শীত বাদে সারা বছর (এপ্রিল)	৩ গ্রাম	৪০×৪০	সারা বছর	৪০
মৌলবী কচু	স্থানীয় কালো	সারা বছর (মার্চ-এপ্রিল)	৯,০০০ গ্রাম	৬০×৩০	-	-
আদা/হলুদ	স্থানীয়	(মধ্য মার্চ-মধ্য এপ্রিল)	১০০০ গ্রাম	৫০×২৫	-	৮০-৯০
ওলকচু	স্থানীয়	মার্চ-এপ্রিল	মাদা প্রতি ১-২টি	৭৫×৭৫	-	১৫০-১৬০
চুপরি আলু	বুলবুলিফেরা স্থানীয়	মার্চ-এপ্রিল	মাদা প্রতি ১-২ টা	-	১২০-১৬০ দিন	গাছ প্রতি ১০-১২
পানি কচু	লতিরাজ স্থানীয়	মার্চ-এপ্রিল	১৫০টি লতা	৬০×৪৫	৬০-৮৫ কান্ড	৮০-৯০ কেজি লতি ১০০ কেজি
পেঁপে	স্থানীয়	মার্চ-এপ্রিল	মাদা প্রতি ৩টি গাছ	২০০×২০০	সারা বছর	গাছ প্রতি ১৫-২০
পেয়ারা	কাজী পেয়ারা	জুন/সেপ্টেম্বর	মাদা প্রতি ১টি	৪০০×৪০০	৮০-৯০	গাছ প্রতি ৮-১০
লেবু	স্থানীয়	জুন/জুলাই	মাদা প্রতি ১টি	২৫০×২৫০	সারা বছর	গাছ প্রতি ১৫০-২০০টি
লাইজনা	স্থানীয়	মার্চ-এপ্রিল	মাদা প্রতি ১টি	সারা বছর	-	

সারণী-২ ঃ সবজি ও ফল উৎপাদনে সার ব্যবস্থাপনা (প্রতি শতাংশে বা ৪০ বর্গমিটারে)

সবজির নাম	সারের মাত্রা (গ্রাম ও ব্যবহারের সময় দিন)											
	গোবর (কেজি)	এসএসপি	জিপসাম	দস্তা (জিঙ্ক অক্সাইড)	সোহাগার গুড়া	এমপি			ইউরিয়া			
						আদি	উ-১*	উ-২*	আদি	উ-১*	উ-২*	উ-৩*
মুলা	৩০	২২৫০	৪০০	৩০	৫০	৫০০	২০০(২১)	২০০ (৩৫)	৬০০	৪৫০	৪৫০	-
বেগুন	৪০	২৫০০	৪০০	৩০	৫০	৬০০	৩০০(৪০)	৩০০(৭৫)	-	৫০০(১৫)	৬০০ (ফুল আসলে)	৬০০ (ফল তোলার সময়)
বাঁধাকপি	৫০	১৫০০	৪০০	৩০	৫০	৬০০	-	৪০০	-	৫০০(১০)	৫০০(২৫)	৬০০(৪০)
লাউ	৬০ (মাদায় ৫০)	১০০০/ মাদা	২০০/ মাদা	২০/ মাদা	২০/ মাদা	১২৫/ মাদা (৪০)	-	১০০/ মাদা (২৫)	১২৫/ মাদা (৪০)	-	১০০/ মাদা (২৫)	১২৫/ মাদা (৭০)
করলা	৪০/ (৪/মাদা)	১২৫০/ (১২৫/মাদা)	২০০/ (২০/মাদা)	২০/ মাদায় (১)	১০/ মাদায় (২)	৩০০/ মাদা (৩০)	১২/ মাদা (৩০)	-	-	২২০(১৫)	২২০(৩০)	২২০(৫৫)
পালং শাক	২০	৬০০	২০০	-	-	২৪০	-	-	-	৩০ (১৫)	২৫০(২৫)	২৫০(৩০)
চাল কুমড়া ও মিষ্টি কুমড়া	৬০ (মাদায় ১০)	২৭০/ মাদা	৪০/ মাদা	৩/ মাদা	-	৩০/ মাদা	৪৫/ মাদা	৪৫/ মাদা	-	৫০/ মাদা (১৫)	৭০/ মাদা (৩৫)	৭০/ মাদা (৫০)
লালশাক	৪০	৬০০	২০০	-	-	৬০০	-	-	১২০	১২০ (১৫)	-	-
ডাটাশাক	৬০	১০০০	২৫০	২০	-	৬০০	-	৪০০	৪০০	-	-	-
ধন্দুল	১০/ মাদা	৪০০/ মাদা	২০০	২০	-	৪০/ মাদা	৩০/ মাদা (২৫)	৩০/ মাদা (৪০)	-	৫০/ মাদা (১৫)	১০০/ মাদা (৩৫)	১০০/ মাদা (৫৫)
ঝিংগা	১০/ মাদা	৪০০/ মাদা	২০০	২০/ (১/মাদা)	-	৪০/ মাদা	৩০/ মাদা (২৫)	৩০/ মাদা (৪০)	-	৫০/ মাদা (১৫)	১০০/ মাদা (৩৫)	১০০/ মাদা (৫৫)
পুঁইশাক	৪০	১২০০	৪০০	২০	২৫	৪০০	৩০০(৪০)	-	-	৪০০(১০)	৪০০(৪০)	৪০০(৭০)
ঢেঁড়স	৪০	১৫০০	৪০০	৪০	২৫	৪০০	২৫০(৪০)	-	-	৩০০(১৫) ৩০০ (১০)	৪০০(৪০) ৩০০(৩০)	৩০০(৭০) ৩০০(৬০)
বরবটি	১০	১৫১৮	৪০০	২০	-	১০০	১০০(২০)	-	-	৮০ (২০)	-	-
মরিচ	-	৩০০০	১৫০০	৪০	৪০	৪০০	২০০	২০০	-	৪০০	২০০	২০০
মুখী কচু	-	১৮০০	৩০০	৩০	২০	৪০০	২০০	২০০	-	৪০০	২০০	২০০
ওলকচু	২/মাদা+ছাই ২৫০ গ্রাম	৩০/ মাদা	৩৫০	২০	-	৩০০	২৫০	২০০	-	২০০	২০০	২০০
চুপরি আলু	৫/মাদা	২০০/মাদা	২০০	২০	-	৪০	৩০(৪০)	৩০ (৮০)	-	৫০/ মাদা (২০)	১০০/ মাদা (৪০)	১০০/ মাদা (৮০)
মৌঃ কচু	২০	২০০	-	-	-	২০০	১৫০	১৫০	-	২০০	১০০	১০০
পেঁপে	১৫/ মাদা	৫০০/ মাদা	২৫০/ মাদা	১০/ মাদা	৩০/ মাদা	২০০/ মাদা	১৫০/ মাদা	১৫০/ মাদা	-	২০০/ মাদা	১৫০/ মাদা	১৫০/ মাদা
পেয়ারা	২৫/ মাদা	৪০০/ মাদা	-	-	-	২০০/ মাদা	১০০/ মাদা	১০০/ মাদা	-	২০০/ মাদা	১০০/ মাদা	১০০/ মাদা
লেবু	২৫/ মাদা	৪০০/ মাদা	-	-	-	২০০/ মাদা	১০০/ মাদা		২০০/ মাদা	১৫০/ মাদা	১৫০/ মাদা	১৫০/ মাদা
লাইজনা	২৫/ মাদা	৪০০/ মাদা	-	-	-	২০০/ মাদা	১০০/ মাদা	১০০/ মাদা	-	২০০/ মাদা	১৫০/ মাদা	১৫০/ মাদা

*উ = উপরি

সারণী-৩ ঃ সবজির বিভিন্ন ধরণের পোকা ও দমন ব্যবস্থা

সবজির নাম	পোকার নাম	ক্ষতিকর পর্যায়	দমন ব্যবস্থা
শিম, বেগুন, লাউ, বাঁধাকপি, টমেটো কুমড়া ও শশা	জাব পোকা	পূর্ণ বয়স্ক ও নিম্ফ	ম্যালথিয়ন-৫৭ ইসি অথবা ম্যারাটাফ-৫৭ ইসি অথবা ম্যালাটক্স-৫৭ ইসি অথবা এডমায়ার-২০০ এসএল প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি মিশিয়ে স্প্রে মেশিন দিয়ে ভালভাবে ছিটাতে হবে। রাসায়নিক কীটনাশক ছাড়াও জৈব কীটনাশক যেমন- নিমের তৈল ও তামাক পাতা ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়। ২০ মিলি নিমের তৈল ৬০ গ্রাম সাবানের গুড়ার সাথে মিশিয়ে পেষ্ট তৈরি করে তা ১০ লিটার পানির সাথে মিশাতে হবে। এরপর উক্ত মিশ্রণকে ছেকে স্প্রে মেশিনে নিয়ে স্প্রে করতে হবে। তামাকের পাতা গুড়াকে একরাত পানিতে ভিজিয়ে রেখে তা ছেকে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে জাব পোকা দমন করা যায়।
শিম, টমেটো ও বরবটি	ফল ছিদ্রকারী পোকা	নিম্ফ/কীড়া	প্রাথমিক ভাবে আক্রান্ত ফলকে জমি থেকে তুলে মাটিতে পুতে ফেললে এ পোকা অনেকাংশ দমন করা যায়, তারপরও আক্রমনের মাত্রা বেশী হলে সেভিন ৮৫ এস পি এর ১০ মিলি এবং ১০ গ্রাম ১০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
বাঁধাকপি	ডায়মন্ড ব্যাক মথ ও স্পোডোপ্টেরা ক্যাটারপিলার	নিম্ফ/কীড়া	আক্রমনের প্রথম দিকে ভোর বেলা জমি পরিদর্শন করে আক্রান্ত গাছ থেকে পোকা ধরে মেরে ফেললে সহজেই এই পোকা দমন করা যায়। কারণ ঐ সময়ে পোকা মাটির উপরে থাকে রৌদ্র উঠে গেলে এরা মাটিতে আশ্রয় নেয়। এই ভাবে ৩-৫ বার কীড়া ধরে মেরে ফেলতে পারলে কীট নাশক ব্যবহারের কোন প্রয়োজন হয় না। আক্রমনের মাত্রা বেশি হলে ডেসিস ২.৫ ইসি মাত্রানুযায়ী স্প্রে করতে হবে।
লাউ, কুমড়া, শশা, করলা, ঝিংগা, চিচিংগা, ধন্দুল, পটল, কাকরল, ও মিষ্টি কুমড়া	ফলের মাছি পোকা	কীড়া (গ্রাব)	বিষটোপ ফাঁদঃ ১০০ গ্রাম সদ্য তোলা মিষ্টি কুমড়া কে ছোট করে কেটে তার সাথে আধা গ্রাম সেভিন পাউডার বা অন্য যে কোন কীটনাশক পানির সাথে মিশিয়ে ১৪ সেমি ব্যাসযুক্ত মাটির পাত্রের ৩/৪ অংশ ভর্তি করে (ছবি-১ অনুযায়ী) জমিতে ১০ গজ দুরে দুরে পেতে রাখলে প্রচুর পরিমাণে পূর্ণ বয়স্ক মাছি পোকা বিষটোপে আকৃষ্ট হয়ে মাটির পাত্রে পড়ে মারা যাবে। তাছাড়া পঁচা বা আক্রান্ত ফল কোন অবস্থাতেই জমির আশেপাশে না ফেলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। এ ছাড়া সেক্সফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পুরুষ মাছি পোকা ধ্বংস করা সম্ভব।
বেগুন	ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা	কীড়া	সমন্বিত দমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই পোকা দমন করা সম্ভব। আক্রান্ত এলাকার সমস্ত জমিতে একই দিনে পোকা আক্রান্ত ডগা ও ফল ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। জমি ও জমির আশপাশ সব সময়ই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। কীটনাশকের ব্যবহার সম্পুর্ণ ভাবে বন্ধ করতে হবে, এতে করে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার শত্রু পোকার বংশ বৃদ্ধি দ্রুত হবে। এছাড়া সেক্সফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পুরুষ মাছি পোকা ধ্বংস করা সম্ভব। উল্লেখ্য, আক্রান্ত একটি জমিতে শুধু সমন্বিত দমন ব্যবস্থা নিলে পোকা দমন সম্ভব হবে না। সকল জমিতে সমন্বিত দমন ব্যবস্থা গ্রহন করে পোকা দমন করতে হবে।

সারণী-৩ ঃ সবজির বিভিন্ন ধরণের পোকা ও দমন ব্যবস্থা

সবজির নাম	পোকার নাম	ক্ষতিকর পর্যায়	দমন ব্যবস্থা
কুমড়া, লাউ, করলা, শশা, কাকরোল ও ঝিংগা	লাল পাম্পকিন বিটল	পূর্ণ বয়স্ক ও কীড়া	হাত দিয়ে ধরে এ পোকা সহজেই মেরে ফেলা যায়। এছাড়া সকাল বেলা ছাই ছিটিয়ে অথবা নিমের তৈল ব্যবহার করে এই পোকা সহজেই দমন করা যায়। নিমের তৈল এর ব্যবহার পদ্ধতি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আক্রমনের মাত্রা বেশি হলে রিপকর্ড ১০ ইসি প্রতি ১০ লিঃ পানিতে অথবা সেভিন ৪৫ এসপি এর ১০ গ্রাম ১০ লিঃ পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে এই পোকা দমন করা যায়।
টমেটো, বেগুন, ঢেঁড়স	সাদা মাছি	পূর্ণ বয়স্ক পোকা	ম্যালিথিয়ন ৫৭ ইসি অথবা এডমায়ার ২০০ এম এল প্রতি ১০ লিঃ পানিতে ১০ মিলি ঔষধ মিশিয়ে পাতার নিচের পৃষ্ঠে স্প্রে করতে হবে। জৈব পদ্ধতিতে দমনের ক্ষেত্রে নিমের তৈল (প্রয়োগ পদ্ধতি পূর্বে বর্ণিত) ব্যবহার করা যেতে পারে।
বাশিম, বেগুন, লাউ, কুমড়া, কাকরল,করলা বাঁধাকপি	কাঠালী পোকা	পূর্ণ বয়স্ক ও কীড়া	নিমের তৈল (প্রয়োগ পদ্ধতি পূর্বে বর্ণিত) ব্যবহার করে খুব সহজেই এই পোকা দমন করা যায়। এছাড়া আক্রমনের মাত্রা বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫০ ইসি অথবা সেভিন ৪৫ এসপি এর ১০ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

সারণী-৪ ঃ সবজির বিভিন্ন ধরণের রোগ ও দমন ব্যবস্থা

সবজির নাম	রোগের নাম	ক্ষতিকর পর্যায়	দমন ব্যবস্থা
টমেটো ও বেগুন	ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট	যে কোন পর্যায়ে	বন্য বেগুন বা তিত বেগুন এর উপর টমেটো বা বেগুনের জোড়কলম করে ৭০-৮০ ভাগ পর্যন্ত এই রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ রোগের জীবাণু মাটিতে থাকে বিধায় আক্রান্ত জমিতে সেচ কমিয়ে দিতে হবে এবং একই জমিতে প্রতি বৎসর একই ধরনের ফসল করা যাবে না। আক্রান্ত গাছ জমি থেকে যত দ্রুত সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে।
টমেটো, শিম, পেঁপে	ভাইরাস	বাড়ন্ত গাছ	সাদা মাছি এ রোগের বাহক। তাই জমিতে যাতে এই পোকা আসতে না পারে সেই জন্য চারা অবস্থা থেকেই প্রতি ৭-১০ দিন পর পর জৈব বা রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। আক্রান্ত গাছ জমি থেকে যত দ্রুত সম্ভব সরিয়ে দিতে হবে। রাসায়নিক কীটনাশক বা জৈব কীটনাশক যেমন-নিমের তৈল (প্রয়োগ পদ্ধতি পূর্বে বর্ণিত) ব্যবহার করা যেতে পারে। পেঁপের ভাইরাস রোগ দমন করতে শতকরা ১ ভাগ কাঁচা দুধের দ্রবন ৫-৭ দিন পর পর ৪/৫ বার স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
বাঁধাকপি, ঢেঁড়স, মিষ্টিকুমড়া, শশা, পটল ও ঝিংগা	শিকড় ও গোড়া পঁচা রোগ	বাড়ন্ত গাছ	এই রোগ হলে জমিতে পানি সেচের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে এবং জমি শুস্ক রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডায়থেন এম-৪৫ অথবা রোভরাল-৫০ WP অথবা এন্ট্রাকল ৭০ WP এর ১০ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২/৩ বার ভাল ভাবে গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।
টমেটো ও আলু	আগাম ও নাবী ধ্বস রোগ	বাড়ন্ত অবস্থায়	এই রোগ খুব দ্রুত ছড়িয়ে পরে তাই রোগ দেখা দেয়ার সংগে সংগেই ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডায়থেন এম-৪৫/এন্ট্রাকল ৭০ WP রিডোমিল গোল্ড এর ২০ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২/৩ বার ভাল ভাবে স্প্রে করতে হবে।

সারণী-৪ ঃ সবজির বিভিন্ন ধরণের রোগ ও দমন ব্যবস্থা

সবজির নাম	রোগের নাম	ক্ষতিকর পর্যায়	দমন ব্যবস্থা
বেগুন	ক্ষুদে পাতা (Little leaf)	বাড়ন্ত গাছ	এই রোগের জীবাণু মাটিতে থাকে। জমিতে এ রোগে আক্রান্ত কোন গাছ দেখা মাত্রই শিকড়সহ তা তুলে ফেলতে হবে। কীটনাশক বা ছত্রানাশক প্রয়োগ করে কোন ফল পাওয়া যায় না।
মরিচ, শিম ও বরবটি	এনথ্রাকনোজ	বাড়ন্ত গাছ	রোগাক্রান্ত মরা ডাল পাতা ছেটে বাগান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছে বর্দোমিশ্রন অথবা ডায়থেন এম-৪৫ অথবা রিডোলি গোল্ড এর ২০ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশেয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।
শিম, বরবটি ও পুঁইশাক	পাতায় দাগ রোগ	বাড়ন্ত গাছ	ক্ষেত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। দাগ দেখা মাত্র বর্দোমিশ্রন অথবা ডায়থেন এম-৪৫ অথবা রিডোমিল গোল্ড এর ২০ গ্রাম প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।
ঢেঁড়স, শিম, শশা কাকরল ও পটল	শিকড়ে গিট রোগ	বাড়ন্ত গাছ	এ ক্ষেত্রে ক্রিমি শিকড়ের মধ্যে গিট সৃষ্টি করে। মাটিতে কুরাটার ৫ জি অথবা ফুড়াডান ৫ জি অথবা রসুনের তৈল প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সবজি সংগ্রহ

বিভিন্ন সবজি বিভিন্ন সময় সংগ্রহ করা হয়। পাতা জাতীয় সবজি যেমন-লালশাক, পালং শাক, পুঁইশাক, ডাঁটা শাক এবং বাঁধাকপি সাধারণতঃ কচি অবস্থায় সংগ্রহ করে খেলে স্বাদ ও পুষ্টি গুনাগুন ভাল পাওয়া যায় এবং বাজারে বিক্রি করলেও ক্রেতারা পছন্দ করেন। পুঁইশাকের পাতাসহ ডগা কেটে সংগ্রহ করলে একই গাছ থেকে অনেকবার সংগ্রহ করা যায়। মুলার পাতা, মুলার চেয়ে বেশী পুষ্টি সমৃদ্ধ। কচুর পাতা ও লতি কচুর চেয়ে অধিক পুষ্টিকর। ঢেঁড়স বেশি বয়স করে তুললে স্বাদ ও পুষ্টি গুনাগুন ভাল থাকে না। ঢেঁড়স সংগ্রহ শুরু হলে প্রায় প্রতিদিনই সবজি বাগান থেকে ঢেঁড়স সংগ্রহ করতে হয়। করলা, বরবটি, লাউ ও বেগুন পরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ করা হয়। টমেটো পরিপক্ক ও পাকা উভয় অবস্থাতেই সংগ্রহ করা যায়। মিষ্টি কুমড়া কাঁচার চেয়ে পাকা অবস্থায় সংগ্রহ করলে অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া চাল কুমড়া পরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ করলে সুস্বাদু হয়। তবে বীজ সংগ্রহ, আচার তৈরি ও বড়ি বানানোর জন্য পাকিয়েও সংগ্রহ করা ভাল।

শাক সবজির ব্যবহার

শাক সবজি সব সময়ই তাজা অবস্থায় খেলে স্বাদ ও পুষ্টি উভয়ই পাওয়া যায়। সবজি বেশি টুকরা করলে পুষ্টিমান কমে যায়। এছাড়া শাক-সবজি কেটে ধৌত করলে পুষ্টিমান কমে যায়। সে জন্য শাক সবজি কাটার আগে ভাল করে ধুয়ে তারপর কাটলে পুষ্টিমানের অপচয় কম হয়। তাছাড়া শাক সবজি সিদ্ধ করতে কিছু পানি লাগে বা সবজি থেকে পানি বের হয়। ঐ সবজির পানি ফেলে দিলে অনেক পুষ্টি উপাদান এর সংগে চলে যায়। সে জন্য সবজি রান্নার সময় কোন পানি ফেলে দেয়া উচিৎ নয়। অনেক সবজি যেমন শশা, মটরশুটি, খিরা, লেটুস, টমেটো ইত্যাদি কাঁচা খাওয়াই উত্তম। এ সমস্ত সবজি সরাসরি গ্রহণে পুষ্টিমান বেশি।

মাঠ পর্যায়ে বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে শাকসবজির বীজ সংগ্রহ ও সংক্ষণের জন্য কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। বীজ সংগ্রহ করার জন্য রোগ-পোকা মুক্ত সুস্থ্য সবল গাছ নির্বাচন করে সেখান থেকে সুস্থ্য সবল পুষ্ট ও বড় আকারের ফল আগে থেকেই চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে। নির্বাচিত ফলগুলি সংগ্রহ করে ঐ ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে ৫-৬ দিন ধরে আলো-ছায়া রোদে অল্প অল্প করে ভাল ভাবে শুকাতে হবে। ঐ বীজ ঠান্ডা করে বোতলে ভরে শক্ত ভাবে ছিপি এটে রাখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই যেন বোতলে/টিনের পাত্রে বাতাস ঢুকতে না পারে। বোতলে বাতাস ঢুকলে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। বর্ষাকালে পাত্র/বোতল থেকে মাঝে মাঝে বীজ বের করে রোদে শুকাতে হয়। এতে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ভাল থাকে। জমিতে বীজ বোনার পূর্বে অবশ্যই একদিন একটু রোদে শুকিয়ে নিলে বীজের সুপ্তাবস্থা ভেঙ্গে যায়। তারপর ঐ বীজের গজানোর ক্ষমতা পরীক্ষা করে নিতে হবে। এটা খুবই সহজ ভাবে করা যায়। একটি প্লেটের উপর টয়লেট পেপার দিয়ে সারি করে বীজ দিয়ে হালকা পানি দিয়ে কয়েকদিন রেখে দিলেই বীজ গজিয়ে যাবে। ঐ গজানো বীজ গুনে শতকরা হার গণনা করলে যদি কমপক্ষে ৯০ ভাগ বীজ গজানো পাওয়া যায়, সেটাই ভাল বীজ হিসেবে গণ্য করা হয়।



চিত্র ঃ উন্মুক্ত জমিতে সবজি চাষ

বসতবাড়িতে সবজির চারা উৎপাদন

সবজি অর্থকরী ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ফসল। "ভাল বীজে/চারায় ভাল ফসল" এ কথা আর কারো অজানা নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সবজি এবং ফলের নার্সারী ব্যবসার অনেক প্রসার ঘটেছে। দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই নার্সারী চোখে পড়ে। নিঃসন্দেহে বলা যায় নার্সারী ব্যবসায় অনেক বেকার মানুষের বিশেষ করে মহিলাদের কর্মসংস্থান এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সবজি চারা উৎপাদনে আধুনিক কলাকৌশল

বাংলাদেশে লাভজনকভাবে চারা উৎপাদন করে যে সব সবজি ও মসলার চাষ করা হচ্ছে তার মধ্যে বাধাঁকপি, ফুলকপি, ওলকপি, ব্রকলি, বেগুন, টমেটো, মরিচ ও পিঁয়াজ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে আগাম শীতকালীন, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন সময়ে সবজি চারা উৎপাদন ক্রমশ প্রসার লাভ করছে। উৎকৃষ্ট চারা উৎপাদনের জন্য প্রচুর দক্ষতা প্রয়োজন। সুস্থ ও সতেজ চারা উৎপাদন ও সঠিক নার্সারী ব্যবস্থাপনা সবজি উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত জরুরী। এ জন্য নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

বীজতলার স্থান নির্ধারণ

বীজতলা তৈরির পূর্বে স্থান নির্বাচনের জন্য নিম্নের কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত ঃ

- বীজতলার জমি অপেক্ষাকৃত উঁচু হওয়া উচিত যাতে বৃষ্টির বা বন্যার পানি দ্রুত নিস্কাশন করা যায়।
- ছায়াবিহীন, পরিস্কার এবং বাতাস চলাচলের উপযোগী স্থানে বীজতলা করা প্রয়োজন।
- পানির উৎস কাছাকাছি এবং বাড়ি বা খামারের নিকটবর্তী হওয়া উচিত।
- বীজতলার মাটি বেলে দো-আঁশ এবং উর্বর হওয়া উচিত। বেলেমাটি বেশি হলে কাঁদা মাটি, গোবর বা কম্পোষ্ট মিশিয়ে অথবা অতিরিক্ত কাঁদা মাটি হলে বালু, কম্পোষ্ট বা গোবর মিশিয়ে মাটির জলধারণ ও নিস্কাশনের উপযোগী করে বীজতলার মাটি উন্নত করা যায়।

বীজতলা তৈরি

একক বীজতলা বা হাপোর সাধারণতঃ এক মিটার চওড়া ও তিন মিটার লম্বা হবে। জমির অবস্থা ভেদে দৈর্ঘ্য বাড়ানো কমানো যেতে পারে। প্রয়োজনে বড় জমিকে ভাগ করে এভাবে একাধিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে। পাশাপাশি দুটি বীজতলার মধ্যে কমপক্ষে ৬০ সেমি ফাঁকা রাখতে হবে। বীজ বপনের কয়েকদিন আগে বীজতলার মাটি ২০-২৫ সেমি গভীর করে ঝুরঝুরা ও ঢেলা মুক্ত করে তৈরি করতে হবে। বীজতলা সাধারণতঃ ১০-১৫ সেমি উঁচু করে তৈরি করতে হবে। সাধারণঃ একভাগ মাটির সাথে একভাগ বালি ও একভাগ পঁচা গোবর সার বা কম্পোষ্ট মিশিয়ে বীজতলার মাটি তৈরি করতে হয়। মাটি উর্বর হলে রাসায়নিক সার না দেয়াই ভাল। উর্বরতা কম হলে প্রতি হাপোরে (খন্ডে) ১ কেজি টিএসপি সার মিশাতে হবে বীজ বপনের অন্তত এক সপ্তাহ আগে। সাধারনতঃ বীজতলায় রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই উত্তম।

বীজ শোধন

বীজতলায় বপনের পূর্বে সবজি বীজ কয়েকটি পদ্ধতিতে শোধন করে নিতে হবে। এগুলোর মধ্যে গুড়ো রাসায়নিক ঔষধ দিয়ে বীজ শোধন পদ্ধতি বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত ও কম ঝামেলা পূর্ণ। প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা ক্যাপটান ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায়। বীজ শোধনের ফলে বিভিন্ন সবজির এ্যানথ্রাকনোজ, লিফস্পট, ব্লাইট ইত্যাদি রোগ ও বপন পরবর্তী সংক্রামন রোধ সম্ভব হয়। বীজ শোধনকারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিষাক্ত বিধায় শোধিত বীজ, শোধন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বীজ পরীক্ষাকরণ

সবজির বীজ বপনের পূর্বে ভাল ভাবে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করে নেয়া প্রয়োজন। ভাল ও বিশুদ্ধ বীজের অভাবে উচ্চ ফলন আশা করা যায় না। বীজের উৎকৃষ্টতা নির্ভর করে তার অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার ওপর। অঙ্কুরোদগমের হার বের করার জন্য পেট্রিডিশ বা ছোট থালা নিয়ে তার উপর ঐ মাপের চোষ কাগজ/টিস্যু পেপার পানি দিয়ে ভিজিয়ে ৫০-১০০টি বীজ সবজি ভেদে কয়েকদিন রেখে অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার বের করে নেয়া যায়।

বীজ বপন

বীজতলায় সারি করে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়, তবে সারিতে বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট দুরত্বে (৪ সেমি) কাঠি বা টাইন দিয়ে ক্ষুদ্র নালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ছোট বীজের বেলায় বীজের দ্বিগুন পরিমাণ শুকনো ও পরিস্কার বালু বা মিহি মাটি বীজের সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে মাটিতে বীজ বপন করতে হবে। যে সমস্ত বীজের আবরণ শক্ত, সহজে পানি প্রবেশ করেনা, সেগুলোকে সাধারণতঃ বোনার পূর্বে ভিজিয়ে নেয়া হয়। হেক্টরপ্রতি ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টমেটো, মরিচ, লালশাক ও লেটুসের জন্য ১২৫, ১৫০, ২৫০, ২৫০, ১০০০ এবং ১৫০০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

চারা উৎপাদনের বিকল্প পদ্ধতি

প্রতিকুল আবহাওয়ায় বীজতলায় চারা উৎপাদনের জন্য বিকল্প হিসেবে সবজির চারা কাঠের বা প্লাষ্টিকের ট্রে, পলিথিনের ব্যাগে, মাটির টবে, গামলায, থালায়, কলার খোলে উৎপাদন করা যায়। কোন কোন সময় কুমড়া, শিম জাতীয় সবজির ও ঢেঁড়সের চারা রোপন করা প্রয়োজন দেখা যায় কিন্তু এসব সবজি রোপন জনিত আঘাত সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না। ছোট আকারের পলিথিনের ব্যাগে বা উপরে উল্লেখিত অন্যান্য মাধ্যমে এদের চারা উৎপাদন করা উচিত যাতে শেকড় ও মাটিসহ চারা রোপন করা যায়।

বীজতলায় আচ্ছাদন

আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বীজতলার উপরে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি ও অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে বীজতলাকে রক্ষা করা যায়। আচ্ছাদন বিভিন্ন ভাবে করা যায়। তবে কম খরচে বাঁশের ফালি করে বীজতলার প্রস্থ বরাবর ৫০ সেমি পরপর পুতে নৌকার ছৈ এর আকারে বৃষ্টির সময় পলিথিন দিয়ে এবং প্রখর রোদে চাটাই দিয়ে বীজতলার চারা গাছ রক্ষা করা যায়।

চারার যত্ন

চারা গজানোর পর থেকে ১০-১২ দিন পর্যন্ত হালকা ছায়া দ্বারা অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে চারা রক্ষা করা প্রয়োজন। পানি সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচর্যা তবে বীজতলার মাটি দীর্ঘ সময় বেশি ভেজা থাকলে অঙ্কুরিত চারার রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। চারার শেকড় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে রোদে কোন ক্ষতি করতে পারে না বরং বীজতলার চারার উপকার হয়। চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর বীজতলায় প্রয়োজন মত দুরত্ব ও পরিমানে চারা রেখে অতিরিক্ত চারাগুলি যত্ন সহকারে উঠিয়ে দ্বিতীয় বীজতলায় সারি করে রোপন করলে মূল্যবান বীজের সাশ্রয় হবে।

দ্বিতীয় বীজতলায় চারা স্থানান্তরকরণ

মূল বীজতলা থেকে তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় সবজি চারা রোপনের পদ্ধতি অনেক দেশেই চালু আছে। এ পদ্ধতিকে দ্বিতীয় সবজির চারা স্থানান্তরকরণ পদ্ধতি বলে। দেখা গেছে ১০-১২ দিনের চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্‌রর করা হলে কপি গোত্রের সবজি ও টমেটো চারার শিকড় বিস্তৃত ও শক্ত এবং চারা অধিক সবল ও তেজী হয়। বাঁশের সুচালো কাঠি বা কাঠের তৈরি সুচালো ফ্রেম দ্বারা সরু গর্ত করে চারা গাছ লাগানো হয়। লাগানোর পর হালকা পানি দিতে হবে এবং বৃষ্টির পানি ও প্রখর রোদ থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন, চাটাই বা কলাগাছের খোল দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

বীজতলায় চারার রোগ দমন

বীজতলায় বপনকৃত বীজ গজানোর পূর্বে বীজ এবং পরে কচি চারা রোগাক্রান্ত হতে পারে। অঙ্কুরোদগমরত বীজ আক্রান্ত হলে তা থেকে আদৌ চারা গজায় না। গজানোর পর রোগের আক্রমন হলে চারার কান্ড মাটি সংলগ্ন স্থানে পঁচে গিয়ে নেতিয়ে পড়ে। একটু বড় হওয়ার পর আক্রান্ত হলে চারা সাধারণতঃ মরে না, কিন্তু এদের শেকড় দূর্বল হয়ে যায়। চারা এভাবে নষ্ট হওয়াকে বলে ড্যাম্পিং অফ। ড্যাম্পিং অফ রোগ বাংলাদেশে চারা উৎপাদনের এক বড় সমস্যা। বীজতলার মাটি সব সময় ভেজা থাকলে এবং মাটিতে বাতাস চলাচলের ব্যাঘাত হলে এ রোগ বেশি হয়। এ জন্য বীজতলার মাটি সুনিস্কাশিত রাখা রোগ দমনের প্রধান উপায়। প্রতিশেধক হিসাবে মাটিতে ক্যাপটান, ডায়থেন এম-৪৫ বা কপার অক্সিক্লোরাইড ১-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজতলার মাটি ভাল করে ভিজিয়ে কয়েকদিন পর বীজ বপণ করতে হবে।

চারার কষ্ট সহিষ্ণুতা বর্ধণ

রোপনের পর মাঠের প্রতিকুল পরিবেশ যখন ঠান্ডা আবহাওয়া বা উচ্চতাপমাত্রা, পানির স্বল্পতা, শুস্ক বাতাস এবং রোপনের ধকল ও রোপনকালীন সময়ে চারা নাড়াচারায় সৃষ্ট ক্ষত ইত্যাদি যাতে সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারে সেজন্য বীজতলায় থাকাকালীন চারাকে কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলা হয়। যে কোন উপায়ে চারার বৃদ্ধি সাময়িক ভাবে কমিয়ে যেমন বীজতলায় ক্রমান্বয়ে পানি সেচের পরিমাণ কমিয়ে বা দুই সেচের মাঝে সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে চারাকে কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলা যায়। কষ্ট সহিষ্ণু বর্ধনকালে চারার শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট) জমা হয় এবং রোপনের পর এই শ্বেতসার দ্রুত নুতন শিকড় উৎপাদনে সহায়তা করে। ফলে সহজেই চারা রোপনজনিত আঘাত সয়ে উঠতে পারে।

চারা রোপন

বীজতলায় বীজ বপনের নির্দিষ্ট সময় পরে চারা মূল জমিতে রোপন করতে হয়। সবজির প্রকার ভেদে চারার বয়স ভিন্নতর হবে। কপি জাতীয় সবজি, টমেটো, মরিচ, বেগুন ইত্যাদির চারা ৩০-৪০ দিন বয়সে রোপন করতে হয়। চারা উঠানোর পূর্বে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। যত্ন করে যতদুর সম্ভব শেকড় ও কিছু মাটি সহ চারা উঠাতে হবে। মূল জমিতে চারা লাগানোর পরপরই গোড়ায় পানি দিতে হবে। চারা সাধারণত বিকেল বেলায় লাগানো উচিত। চারা লাগানোর কয়েকদিন পর পর্যন্ত গাছে নিয়মিত পানি দিতে হবে।

ভাল চারার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- চারা স্বাভাবিক আকারের অর্থাৎ বেশি বড়ও নয় ছোটও নয়;
- কমপক্ষে ৫/৬ টি পাতা যুক্ত;
- রোগের সবরকম লক্ষণ থেকে মুক্ত;
- শেকড় অক্ষত ও মাটির দলায় জড়ানো;
- পুরু কান্ড ও সতেজ চেহারা এবং
- স্বাভাবিক সবুজ পাতা। অত্যাধিক গাঢ় সবুজ চারায় নাইট্রোজেনের আধিক্য নির্দেশিত, তাই এ সব চারা দূর্বল হয়।

সারণী-১ ঃ বিভিন্ন সবজি বীজের অঙ্কুরোদগমের গ্রহণযোগ্য হার এবং অঙ্কুরোদগমের সময় (দিন)

সবজি	অঙ্কুরোদগমের গ্রহণযোগ্য হার (%)	বীজ অঙ্কুরোদগম/গজানোর সময় (দিন)
ফুলকপি	৭৫	৪
বাঁধাকপি	৭৫	৩
টমেটো	৭৫	৬
বেগুন	৭০	৫
মুলা	৭৫	৩
শসা	৮০	৩
তরমুজ	৭০	৩
পালংশাক	৬০	৫
ঢেঁড়স	৫০	৬
মরিচ	৫৫	৮
মিষ্টি কুমড়া	৭৫	৩
গাজর	৫৫	৬
পিঁয়াজ	৭০	৪
লেটুস	৮০	২

সারণী-২ ঃ মূল জমিতে রোপনের জন্য চারার সঠিক বয়স

সবজি	চারার বয়স (দিন)	সবজি	চারার বয়স (দিন)
ফুলকপি	৩০-৩৫	টমেটো	৩০-৩৫
বাঁধাকপি	৩০-৩৫	বেগুন	৪০-৫০
ওলকপি	৩০-৩৫	পিঁয়াজ	৫০-৬০
লেটুস	৩০-৪০	পালংশাক	৩০-৪০
বীট	৩০-৪০	মরিচ	৪০-৫০

সারণী-৩ ঃ বিভিন্ন সবজি বীজ শোধনের পদ্ধতি

শস্য	ঔষধের নাম	প্রতি ১০০ কেজি বীজের ঔষধের পরিমান (গ্রাম)	প্রয়োগের পদ্ধতি
বেগুন	থাইরাম ৭৫% ডাষ্ট	২৫০	শুষ্ক শোধন
মরিচ	ক্যাপটান ৭৫% ডাষ্ট	২৫০	শুষ্ক শোধন
টমেটো	থাইরাম ৭৫% ডাষ্ট	৩৩৫	শুষ্ক শোধন
বাঁধাকপি, ফুলকপি ও ওলকপি	থাইরাম ৭৫% ডাষ্ট	৮৫	শুষ্ক শোধন
কুমড়া জাতীয়	থাইরাম ৭৫% ডাষ্ট	২৫০	শুষ্ক শোধন
	ক্যাটান ৭৫% ডাষ্ট	২৫০	শুষ্ক শোধন
শিম, মটর ও কাউপি	থাইরাম ৭৫% ডাষ্ট	১২৫	শুষ্ক শোধন
	ক্যাপটান ৭৫% ডব্লিউ ডিপি	-	শুষ্ক শোধন
পাতা জাতীয় সবজি	থাইরাম ৭৫% ডাষ্ট	৩৩৫	শুষ্ক শোধন
মূল জাতীয় বান্ধব ফসল	থাইরাম ৭৫% ডাষ্ট	২৫০	শুষ্ক শোধন
ঢেঁড়স	থাইরাম ৭৫% ডাষ্ট	১০০	শুষ্ক শোধন
	ক্যাপটান ৭৫% ডব্লিউ ডিপি	২৫০	শুষ্ক শোধন

বসতবাড়িতে ফল গাছের মিনি নার্সারী

আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত যা দেহে শক্তি যুগায়। কিন্তু শরীরের বৃদ্ধি, উন্নতি ও সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য সকল খাদ্য উপাদান ভাতে নেই। বিভিন্ন ভিটামিন ও খনিজ লবন যা আমিষ, তৈল, শর্করা ইত্যাদি প্রধান খাদ্য উপাদানগুলোকে কার্যকরভাবে শরীরে বৃদ্ধি এবং দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এ ধরনের খাদ্য উপাদান বিভন্ন ফল ও শাক-সবজিতে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের দেশে ফল উৎপাদন ও গ্রহনের পরিমাণ অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া দেশের বেশীরভাগ জনগোষ্ঠী দরিদ্র। তাদের ফল খাওয়ার পরিমাণ কম হওয়ায় শারীরিক দিক দিয়ে তার দূর্বল এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত। সুষম পুষ্টি ও দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশি পরিমাণে ফল ও সবজি খাওয়া একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন ফল গাছ লাগানোর ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করায় সাধারণ জনগণের মাঝে ফল গাছ লাগানোর আগ্রহ যথেষ্ট বেড়েছে। কথায় বলে, "ভাল বীজে ভাল চারা এবং ভাল চারায় সুস্থ গাছ"। তাই ফলের নার্সারীকে লাভজনক করতে পরিকল্পনামাফিক নার্সারী স্থাপন, সুস্থ-সবল সুন্দর চারা উৎপাদন এবং সুষ্ঠু নার্সারী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নার্সারী মালিকদের পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা বাঞ্জনীয়। নার্সারী স্থাপনে বিবেচ্য বিষয় নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

- নার্সারী স্থাপনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব।
- ফলজ বৃক্ষ লাগানোর জন্য চারা গাছ প্রয়োজন। আর এ চারা গাছ উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে নার্সারী।
- ফলের নার্সারী থেকে অল্প সময়ে অধিক আয় করা যায়। তাছাড়া নার্সারী স্থাপনে বেশি জায়গার দরকার হয় না, তাই অল্প জায়গা থেকে অধিক আয় করা সম্ভব।
- নার্সারী স্থাপনে বড় ধরনের মূলধনের প্রয়োজন হয় না বা ঋণ নেয়ার প্রয়োজন হয় না। অল্প মূলধন দিয়ে অল্প জায়গা নিয়ে নার্সারীর কাজ শুরু করা যায়।
- এতে প্রশিক্ষণের তেমন প্রয়োজন হয় না। অবসর সময়ে নার্সারীর পরিচর্যা করা যায়। পরিবারের সদস্যরাও সাহায্য করতে পারে। যারা আমের কলম করা শিখেছেন তারা অন্যের নার্সারীতে কলম করে ভাল পয়সা উপার্জন করতে পারেন।
- উন্নত জাতের ফলের চারা সহজলভ্য হলে মানুষ ফলগাছ লাগাতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। বেশি ফল গাছ লাগানো মানে বেশি আয়, বেশি পুষ্টি।
- সরকার কর্তৃক "একটি বাড়ি একটি খামার" কর্মসূচীর মাধ্যমে কৃষকের বাড়ির আঙ্গিনায় বেশি বেশি ফল গাছ লাগানোর এক উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতেও বেশি বেশি ফল গাছ লাগানোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি ভাল উদ্যোগ। ফলের উৎপাদন বাড়াতে হলে আরো বেশি হারে চারার উৎপাদন বাড়াতে হবে। এ জন্য আরো ফলদ নার্সারী স্থাপন করা প্রয়োজন।

নার্সারী তৈরির কলাকৌশল ও স্থান নির্বাচন

- নার্সারীর সাথে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। নার্সারী বড় রাস্তার ধারে বাড়ির পাশে স্থাপন করতে পারলে ভাল হয় কেননা সহজেই তা মানুষের নজরে পড়বে। এর ফলে যাতায়াত পথের অনেক যাত্রী চারা ক্রয়ে আগ্রহী হয়ে উঠবেন।
- যে এলাকায় নার্সারী স্থাপন দরকার হবে সেখানে যেন সহজে শ্রমিক পাওয়া যায়। সময়মত কাজের জন্য শ্রমিক পাওয়া না গেলে ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে।
- নার্সারীতে পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকতে হবে কেননা চারা গাছ উৎপাদনের জন্য পানি অতীব প্রয়োজনীয়। নার্সারীতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা রাখা ভাল।
- একটি ভাল নার্সারী শুধু স্থাপন করলেই হবে না চারা বিক্রয়ের জন্য একটি ভাল বাজার থাকা প্রয়োজন।

জায়গা নির্বাচন

- কিছুটা উঁচু, বন্যার পানি উঠে না এমন জমি নার্সারীর জন্য উপযুক্ত।
- বৃষ্টির পানি জমে না বা দ্রুত নিস্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত জমি।
- এঁটেল মাটি চারা উৎপাদনের জন্য ভাল নয়। দোঁ-আশ বা বেলে দোঁ-আশ মাটি বেশি উপযুক্ত। একান্ত প্রয়োজন হলে এঁটেল মাটিতে বালি ও জৈব সার মিশ্রণ করে তা উন্নত করা যেতে পারে।

জমি তৈরি

- বীজ লাগানোর পূর্বে প্রয়োজনীয় চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হবে।
- নার্সারীর জমিতে গোবর, খৈল বা জৈব সার প্রয়োগ করতে পারলে খুব ভাল হয়। জৈব সার দিলে মাটির উন্নয়ন ঘটে। জৈব সার পাওয়া না গেলে সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার দেয়া যেতে পারে।
- কোন জমিতে প্রতি বছর একই ধরণের চারা উৎপাদন করলে তাতে মাটিবাহিত রোগের আক্রমণ বাড়তে পারে। এ জন্য মাঝে মাঝে নার্সারীর মাটি শোধন করা একান্ত প্রয়োজন। পর্যায়ক্রমে নার্সারীর কিছু জমি পতিত রাখতে হবে এবং ধৈঞ্চার চাষ করে মাটিতে জৈব সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

নার্সারীর ব্যবসায় সফলতা অর্জন

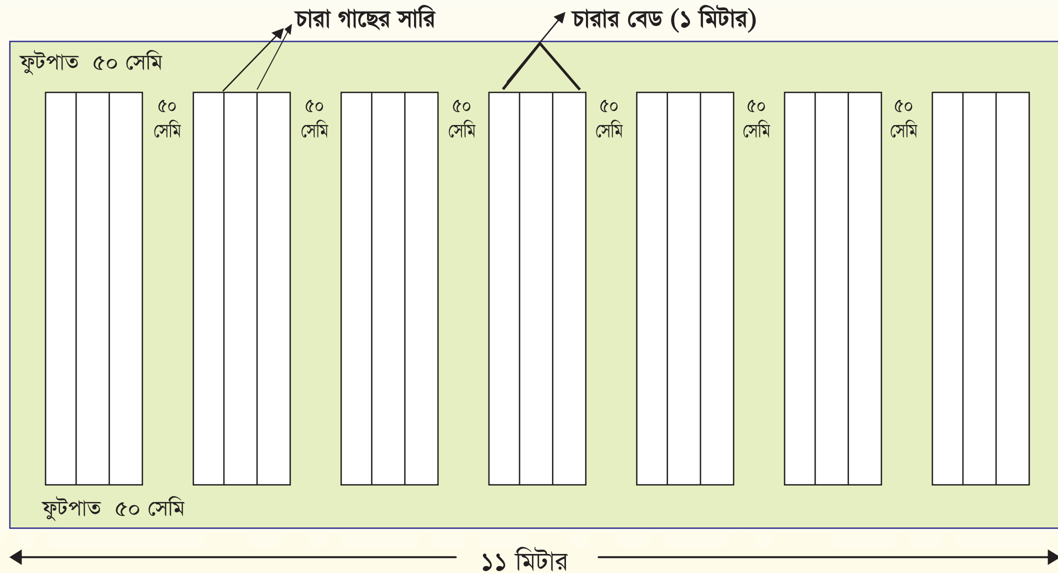
- নার্সারী ব্যবসায়ে পূর্ণ বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হবে। আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের চারা লাগানোর কয়েক বছর পর ফল দেওয়া শুরু করে। যেহেতু ফলধারণের আগে গাছের জাত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না তাই কোন কোন নার্সারীর খামারী খারাপ জাতের চারা গাছ ভাল জাতের বলে বিক্রয় করে থাকেন। এটি মারাত্নক অপরাধ।
- আমের চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিজস্ব বাগান বা বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আমের ডগা বা সায়ন সংগ্রহ করতে হবে। কলম করার সময় পূর্ণ তদারকী করতে হবে যাতে কোন মালী নির্দিষ্ট জাতের সায়ন ছাড়া অন্য জাতের সায়ন ব্যবহার না করে।
- রোগ বালাই বা পোকা মাকড়ের আক্রমণ হলে চারা গাছ দ্রুত মারা যেতে পারে। এজন্য প্রতিদিন কমপক্ষে একবার নার্সারী পরিদর্শন করতে হবে। চারা গাছের কোন সমস্যা দেখা দিলে তা ভালভাবে পরখ করে দেখতে হবে এবং দমনের জন্য তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নার্সারীকে দেখতে আকর্ষনীয় করতে হবে এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। মাঝে মাঝে আদর্শ নার্সারী পরিদর্শন করতে হবে।
- এটি একটি ব্যবসা। এখানেও নিজস্ব মেধা খাটিয়ে কাজ করতে হবে। ক্রেতা কি ধরণের পণ্য পছন্দ করে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। নার্সারীতে চাষাবাদ সম্পর্কিত কিছু বইপত্র, ছোটখাট নার্সারী উপকরণ, সবজি এবং ফুলের চারা বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখতে পারলে বাড়তি অর্থ আয় করা সম্ভব হবে।
- সুস্থ সবল চারা সরবরাহ করতে হবে। রোগাক্রান্ত চারা বিক্রয় করা অনুচিত। আম কাঁঠালের চারা মাটি থেকে উঠানোর আগে প্রধান শিকড়টি কেটে দেয়া হয়। পার্শ্ব শিকড় না গজানো পর্যন্ত এ চারা মাটি থেকে তোলা ঠিক নয় কারণ এ ধরণের চারা মারা যেতে পারে।
- বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র বা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। উদ্ভাবিত নতুন জাত বা নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকতে হবে এবং নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে। মাঝে মাঝে কৃষি বিশেষজ্ঞদের নার্সারীতে আমন্ত্রণ জানিয়ে পরামর্শ নিতে হবে।
- কৃষকের নিকট থেকে বীজ বা চারা কিনে তা বিক্রয় করা ঠিক নয়। কারণ তা রোগাক্রান্ত বা ত্রুটিযুক্ত হতে পারে। নিজেই বীজ উৎপাদন করতে হবে নতুবা বিশ্বস্ত স্থান থেকে বীজ/চারা কিনতে হবে।
- সব সময় টবে বা শক্ত পলিথিন ব্যাগে কিছু চারা রাখা ভাল। কিছু গ্রাহক অমৌসুমে/অসময়ে ফলের চারা ক্রয় করতে আসে তাদের নিকট টবে রাখা চারা বিক্রয় করা সুবিধা হয়।

আমের নার্সারী স্থাপন প্রযুক্তি (নমুনা দেওয়া হল)

আমের নার্সারী স্থাপন একটি সহজ ও সাধারণ প্রযুক্তি। বাড়ির উঠোনে ১১ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১০ মিটার প্রস্ত (১১০ বর্গমিটার) বিশিষ্ট জায়গায় একটি নার্সারী স্থাপনের প্রযুক্তি নিম্নে উপস্থাপন করা হল। বাড়ির উঠানে বা আশেপাশের অব্যবহৃত জমিতে ছোট আকারের এ নার্সারী স্থাপন করা যায়। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষীগণ অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে অতি সহজেই অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন। এ ধরণের নার্সারী স্থাপনে বেশি জমির প্রয়োজন হয় না বা বড় মূলধনের প্রয়োজন পড়ে না। অবসর সময়ে কৃষক এ নার্সারীতে কাজ করতে পারেন। কৃষক পরিবারের অন্যান্য সদস্যও এ নার্সারীতে সাহায্য করতে পারেন। বাইরের শ্রমিক নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না বিধায় শ্রমিক সংক্রান্ত খরচ হয় না।

জমি তৈরি ও আঁটি বপণ

নার্সারীর জন্য নির্ধারিত জায়গাটি ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। এক মিটার চওড়া ও ১৫ সেমি উঁচু ৭টি বেড তৈরি করতে হবে। এক বেড থেকে অপর বেডের দুরত্ব হবে ৫০ সেমি তবে নার্সারীর চতুর্দিকে ৫০ সেমি ফুটপাত রাখতে হবে। বেডগুলোতে সার (গোবর বা জৈব সার ১০০ কেজি, ইউরিয়া ২ কেজি, টিএসপি ৩ কেজি, পটাশ ২ কেজি, জিপসাম ১ কেজি) প্রয়োগ করার পর প্রতি বেডে ২ সারি আমের আঁটি লাগাতে হবে। সুস্থ ভারী ও বড় আঁটি লাগানো ভাল এতে ভাল চারা উৎপন্ন হবে। সারি থেকে সারির দুরত্ব ৫০ সেমি এবং আঁটি থেকে আঁটির দুরত্ব ২৫ সেমি হওয়া বাঞ্ছনীয় (নার্সারীর নকশা দ্রষ্টব্য)। এভাবে ৭টি বেডে মোট ১৪টি সারি হবে। আঁটি লাগানোর উপযুক্ত সময় জুন মাস। কোন আঁটির অঙ্কুরোদগম না হলে ফাঁকা জায়গায় আঁটি/চারা লাগিয়ে পূরণ করে দিতে হবে। কোন চারায় বিকৃত রোগ দেখা দিলে তা উঠিয়ে ফেলতে হবে। আঁটি থেকে উৎপন্ন চারাগুলোতে প্রয়োজনমত সার, সেচ ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে যেন চারাগুলো দ্রুত বাড়তে পারে (ছবি-১)। চারা কলম করার আগে দুইবার বা ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।



চিত্র ঃ নার্সারীর নকশা

বেড থেকে বেড = ৫০ সেমি, লাইন থেকে লাইন = ৫০ সেমি, গাছ থেকে গাছ = ২৫ সেমি
প্রতি সারিতে চারার সংখ্যা = ৩৬টি, মোট সারির সংখ্যা = ১৪ টি, মোট গাছের সংখ্যা = ৫০৪টি

কলমকরণ

চারার বয়স ১০/১২ মাস হলে বা পরবর্তী বছর জুন বা জুলাই মাসে প্রতিটি চারা গাছে উন্নত জাতের সায়ন বা ডগা দিয়ে কলম করতে হবে। কলমের ক্ষেত্রে ক্লেফট বা ভিনিয়ার উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে তবে ক্লেফট পদ্ধতিতে কলমকৃত গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ভাল জাতের আমের সায়ন বিভিন্ন সরকারী বা বিশ্বস্ত বেসরকারী নার্সারী বা নিজস্ব আম বাগান থেকে সংগ্রহ করতে হবে। কলমকৃত চারাগুলো এক বছরে প্রায় দুই/আড়াই মিটার উঁচু হবে এবং বিক্রয়ের উপযোগী হবে। আমের চারা বিক্রয় উপযোগী করে গড়ে তুলতে (আঁটি লাগানো থেকে বিক্রয় পর্যন্ত) প্রায় ২ বছর সময় লাগে।



চিত্র ঃ ক্লেফট পদ্ধতি কলম চারা তৈরির বিভিন্ন ধাপ

স্মরণীয় বিষয়

- মৌসুমের শেষের দিকে ক্লেফট পদ্ধতি ব্যবহারে সফলতা অনেক কম তাই এ পদ্ধতি কেবলমাত্র মৌসুমের প্রথম দিকে ব্যবহার করা উত্তম। ভিনিয়ার পদ্ধতিতে মৌসুমের সকল সময় কলম করা যায়।
- নির্ধারিত দুরত্বে আঁটি লাগাতে হবে। ঘন করে আঁটি লাগালে গাছ লিকলিকে হবে, সবল হবে না।
- বাণিজ্যিক জাতের আঁটির চেয়ে গুটি জাতের আঁটি থেকে ভাল চারা উৎপন্ন হয় তাই গুটি জাতের আঁটি বপণ করতে হবে।
- দূর্বল রোগাক্রান্ত চারায় কলম করা এবং রোগাক্রান্ত গাছের ডগা বা সায়ন কলমের জন্য ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়।
- অমৌসুমে চারা বিক্রি/সরবরাহের সুবিধার্থে কিছু চারা টবে তুলে রাখতে হবে।
- আমের বড় চারা বেশি দামে বিক্রি করা যায় তাই দ্রুত বাড়ার জন্য চারার ভাল যত্ন নিতে হবে।

চারার পরিচর্যা

কলমকৃত চারা গাছ আগাছা মুক্ত রাখতে হবে এবং নিয়মিতভাবে সার ও শুস্ক মৌসুমে সেচ দিতে হবে যাতে চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। চারাগুলো যাতে সোজা হয়ে বেড়ে উঠতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে, প্রয়োজনে চারার গোড়ায় কঞ্চি বা বাঁশের বাতার তৈরি খুঁটি দিতে হবে। চারা গাছে দু'বার ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

রোগ ও পোকা দমন

চারা গাছে পাতা কাটা উইভিলের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এ পোকা গাছের কচি পাতায় ডিম পাড়ে এবং এবং পাতাটি কেটে দেয় । পাতাগুলি পুড়িয়ে ফেললে পাতায় রক্ষিত ডিম ধ্বংস হবে এবং পোকার বংশবৃদ্ধি লোপ পাবে। আক্রমণ বেশি হলে সেভিন ৮৫ এসপি (প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম) সন্ধ্যা সময় স্প্রে করতে হবে কেননা এ পোকা রাতের বেলায় বের হয়। চারা গাছের কচি পাতায় এনথ্রাকনোজ রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণে পাতায় বাদামী বা কালচে দাগ পড়ে ফলে আক্রান্ত স্থানের কোষ মারা যায় এবং পুরো পাতা নষ্ট হয়ে ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যেতে পারে। আক্রমন দেখা দিলে ডায়থেন এম-৪৫ বা ইন্ডোফিল এম-৪৫ (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম) স্প্রে করতে হবে।

অনেক সময় ডগার কুঁড়ি জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যায় যা আগা মরা নামে পরিচিত। কিছু সুস্থ জায়গাসহ মরা ডগা কেটে ফেলতে হবে এবং নতুন কুশি বের হলে তাতে পূর্বোক্ত এনথ্রাকনোজ রোগে ব্যবহৃত ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। চারা গাছ বিকৃতি রোগে আক্রান্ত হলে গিট থেকে অসংখ্য কুশি বের হয়ে জটলার সৃষ্টি করে। এতে আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোন কোন সময় বেশি আক্রান্ত গাছ মারা যায়। কোন বিকৃত চারা দেখা দিলে তা কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

চারা উত্তোলন

কলম করার এক বছর পর চারাগুলো বিক্রয়ের বা রোপণের উপযোগী হবে। মাটি থেকে চারা তোলার এক মাস পূর্বে মাটি ১০/১২ সেমি (৪/৫ ইঞ্চি) গভীরে চারার প্রধান শিকড় ধারাল শাবল দ্বারা কেটে দিতে হবে। এ সময় কিছু নতুন শিকড় গজাবে। মাটি থেকে চারা তোলার সময় খেয়াল রাখতে হবে চারার শিকড়ের সাথের মাটির বলটি যেন ভেঙ্গে না যায়। চারার গোড়ার মাটি খড়া দিয়ে ভালভাবে বেঁধে দিতে হবে যেন পরিবহনের সময় বলটি না ভাঙ্গে। চারা মাটি থেকে তোলার পূর্বেই জাতের নামযুক্ত একটি ট্যাগ সংযুক্ত করতে হবে।

আনুমানিক খরচ

আমের নার্সারী তৈরি করতে তেমন খরচ হয় না। আয়ের তুলনায় এ খরচ বেশ কম। নিচে ১১০ বর্গমিটার জায়গা আমের নার্সারী স্থাপনের আনুমানিক খরচ দেয়া হল ঃ

ক্রমিক নং	*খরচের খাত	পরিমাণ	খরচ (টাকায়)
০১।	আমের আঁটি	৬০০টি	১৫০.০০
০২।	জৈব ও রাসায়নিক সার	-	৬০০.০০
০৩।	কীটনাশক/ছত্রাকনাশক	-	৬০০.০০
০৪।	চাকু/ছুরি, সুতলী, পলিথিন	-	৫০০.০০
০৫।	নার্সারীর বেড়া	-	৭০০.০০
০৬।	আমের সায়ন বা ডগা ক্রয়	৫৫০টি	১১০০.০০
০৭।	কলম তৈরি (মালী নিয়োগ করলে)	৫০৪টি	১০০৮.০০
		মোট খরচ	**৪৬৫৮.০০**

* খরচের ক্ষেত্রে জমি তৈরি বা শ্রমিকের মজুরী ধরা হয়নি।

প্রত্যাশিত আয়

প্রতি ১১০ বর্গমিটার জমিতে ৫০৪টি চারা লাগানো যায় যা থেকে ৫০৪ টি কলম চারা তৈরি করা সম্ভব। বেসরকারী পর্যায়ে ভাল জাতের বড় আমের চারা প্রতিটি ১০০.০০-২০০.০০ টাকায় বিক্রয় হয়ে থাকে। প্রতিটি চারা ১০০.০০ টাকা হারে বিক্রয় করলে ৫০,৪০০.০০ টাকা উপার্জন করা সম্ভব। আমের চারা বিক্রয় উপযোগী করতে ২ বছর সময় লাগে তাই প্রতি বছর গড়ে ২৫,২০০.০০ (পঁচিশ হাজার দুইশত) টাকা আয় করা যায়।

বসতবাড়ির আঙ্গিনায় চিবিয়ে খাওয়ার ইক্ষু চাষ

প্রযুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য



চিত্র ঃ চিবিয়ে খাওয়ার ইক্ষু চাষ

ইক্ষু বাংলাদেশে খাদ্য ও শিল্পে ব্যবহার্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান অর্থকরী ফসল। এ দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে চিনি ও গুড় উৎপাদনকারী ফসল হিসেবে আখের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO) এর হিসাব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পুষ্টি মানদন্ডে জনপ্রতি বাৎসরিক ১৩ কেজি চিনি খাওয়া প্রয়োজন যা শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তির ১৫ ভাগ চিনি থেকে মেটানো যায়। বাংলাদেশে প্রায় সকলের কাছেই চিবিয়ে খাওয়ার ইক্ষু খুব প্রিয়। ইক্ষু চিবিয়ে খেতে ছেলে-বুড়ো সবারই পছন্দ। ইক্ষুর রস কেবল মাত্র শরীরে চিনির প্রয়োজনই মেটায় না, এতে ভিটামিন ও অন্যান্য খাদ্য উপাদানও রয়েছে। আখের রস তৃপ্তিদায়ক এবং স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রতি ১০০ গ্রাম ইক্ষুর রসে ৯০.২ গ্রাম পানি, ০.১ গ্রাম প্রোটিন, ০.২ মিলি গ্রাম চর্বি, ০.৪ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ৯.১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১০.০ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম, ১০.০ মাইক্রো গ্রাম ফসফরাস, ১.১ মাইক্রোগ্রাম লৌহ, ০.০৪ মাইক্রো গ্রাম রিবোফ্লাভিন, ৬.০ মাইক্রো গ্রাম ক্যারোটিন থাকে। ১০০ গ্রাম আখের রস থকে ৩৯.০ কিলো ক্যালোরী শক্তি পাওয়া যায়। ইক্ষুর রস পান দাঁতের ক্ষয়রোধ এবং হজম ক্রিয়ায় সহায়তা করে। চিনি বা গুড় উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত আখের তুলনায় চিবিয়ে খাওয়ার ইক্ষু জাতের কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে।

জাত নির্বাচন

জাতের মধ্যে অমৃত, সিও ২০৮, সিও ৫২০, কিউ ৬৯, মিশ্রিদানা, মিশ্রিমালা, কাজলা, গাজীপুরি গ্যান্ডারী, তুরাগ গ্যান্ডারী, বারং, মানা, মোম্বে, বাঁশ কুশাইল ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয়। এসমস্ত জাতের মধ্যে সিও ২০৮ ও অমৃত জাতটি সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত।

বীজ নির্বাচন

চিবিয়ে খাওয়ার ইক্ষু জাতসমূহ সাধারণতঃ বিভিন্ন রোগের প্রতি সংবেদনশীল। কাজেই উচ্চ মানসম্পন্ন বীজ নির্বাচন ভাল ফলন পাওয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ইক্ষুর নীচের এক তৃতীয়াংশ বাদ দিয়ে উপরের অংশ অথবা ডগা বীজ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

বীজ শোধন

চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষুর বীজের মূল্য চিনি বা গুড় উৎপাদনের জন্য আবাদকৃত ইক্ষুর চেয়ে অনেক বেশি এবং দুষ্প্রাপ্য। তাই বীজ ইক্ষু যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সে জন্য ৮ গ্রাম ব্যাভিস্টিন বা নোইন নামক ছত্রাক নাশক ৮ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১ বিঘা জমির জন্য তৈরি বীজ খন্ড পর্যায়ক্রমে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে শোধন করে নিতে হয়।

রোপণ পদ্ধতি

চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষু সাধারনত মাদা পদ্ধতিতে রোপণ করা হয়। জমিতে কোন নালা না করে ১ মিটার দুরে দুরে ৩০ সেমি ব্যাসের ৩০ সেমি গভীর মাদা তৈরি করে প্রতি মাদায় ২টি চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দুরত্ব ১.২৫ মিটার হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ

সারের নাম	প্রতিটি মাদার জন্য (গ্রাম)
গোবর/কম্পোস্ট	১০০
খৈল	৮০
ইউরিয়া	২০
টিএসপি	১৫
এমপি	১৫
জিপসাম	১০
দস্তা	৬

গোবর বা কম্পোস্ট সারের সবটুকুই মাদায় প্রয়োগ করে ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ খৈল, টিএসপি, জিপসাম, দস্তা এবং অর্ধেক এমপি ও এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার একত্রে মিশিয়ে মাদায় বা গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভবে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার চারা রোপণের ৬০-৭৫ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ১/৩ অংশ ইউরিয়া এবং ১/২ অংশ ইউরিয়া এবং ১/২ অংশ এমপি সার রোপণের ১২০ দিন পরে মাদায় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

কর্তন ও বাজারজাতকরণ

সাধারণতঃ ভাদ্র মাস থেকে চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষুর পরিপক্কতা আসে। এ সময় ক্ষেতের মাটি সমান করে মাথার দিকে ডগাসহ ৪-৫টি পাতার কিয়দাংশ রেখে আখ কেটে ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে। পরবর্তীতে একই আকারের পরিস্কার আখ ৫০টি বা সুবিধামত সংখ্যা নিয়ে আটি বেঁধে বাজারে বিক্রি করতে হবে। বাড়ির আঙ্গিনায় উৎপাদিত ইক্ষু আলাদা আলাদা করে কেটে ব্যবহার করা যাবে।

লাভ/ক্ষতির বিবরণ

প্রতিটি বাড়িতে ৪-৫টি ইক্ষু ঝাড় উৎপাদন করে প্রতিটি ঝাড়ে ১০টি করে ইক্ষু উৎপাদিত হলে বছরে প্রায় ৮০০.০০-১০০০.০০ টাকা আয় করা সম্ভব। মাদা প্রতি খরচ ৫০.০০ টাকা। এ ছাড়া পরিবারের সদস্যদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়।

বসতবাড়িতে ফলদ গাছ রোপণ

ফল ছোট-বড় সকলের নিকট অতি প্রিয়। আমাদের দেশে নানা ধরনের ফল জন্মে থাকে। প্রধান প্রধান ফলের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, কুল, বাতাবী লেবু, কলা, পেঁপে ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া নানা বৈচিত্রের ফল যেমন-বেল, কথবেল, আমড়া, আমলকি, লটকন, অরবরই, চালতা, ডেওয়া, করমচা, সফেদা, কামরাঙ্গা, আতা, শরিফা, তাল, জলপাই, তেতুঁল ইত্যাদি ফল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। কথায় আছে ফলই বল। ফলের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ।

অর্থনৈতিক, পুষ্টি ও পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ফল বৃক্ষ যে কোন পরিবারের জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ। অধিকাংশ বাড়িতে অবহেলা অযত্নে ফল বৃক্ষ জন্মে থাকে। এগুলোর বেশির ভাগই স্থানীয় অনুন্নত জাত এবং বীজ থেকে উৎপন্ন। ফলে এদের ফলন খুব কম হয়। কাজেই ফল গাছের উন্নয়ন ও ফলন বৃদ্ধির জন্য আমাদের আরও অধিক সচেষ্ট হতে হবে। উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে ফল গাছ আরও অধিক ফলনশীল করা যেতে পারে। তাই ফল গাছের সুষ্ঠু পরিচর্যা অত্যন্ব জরুরী।

বাংলাদেশের ১৯.৯ মিলিয়ন বসতবাড়িতে জাতীয় বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীর মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে উন্নত জাতের ফল গাছ রোপণ ও পরিচর্যার মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

স্বারণী-১ ঃ বিভিন্ন ফলের উন্নত জাত ও বৈশিষ্ট্যবলীর বিবরণ

ফলের নাম	জাত এবং ফলন	উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যবলী	চাষ উপযোগিতা
পেয়ারা	কাজী পেয়ারা (২৩ টন/হেঃ)	বছরে ২ বার ফল ধরে	বাংলাদেশের সব স্থানেই চাষ করা যায়।
	বারি পেয়ারা-২ (২৪.৫ টন/হেঃ)	উচ্চ ফলনশীল, ফল মাঝারী আকারের ও মিষ্টি	সমগ্র বাংলাদেশেই এর চাষ করা যায়।
	বাউ পেয়ারা-৬ (জেলি)	উচ্চ ফলনশীল, ফল ডিম্বাকারের এবং সাদাটে শ্বাসের বর্ণ লাল; ফলের স্বাদ অতি টক	বাংলাদেশের সব স্থানেই চাষ করা যায়।
আম	বারি আম-১ (১৫ টন/হেঃ)	নিয়মিত ফলদানকারী রঙ্গিন	- ঐ -
	বারি আম-২ (৪১ কেজি/গাছ)	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত	- ঐ -
	বারি আম-৩ (৩৫ কেজি/গাছ)	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত	বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলেই চাষ করা যায়।
	বারি আম-৪ (হাইব্রীড) ১২ টন/হেঃ	নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত	দেশের সর্বত্রই
	বাউ আম-১ (শ্রাবণী)	নাবি জাত, হালকা সবুজ, গাছ বামন, টিএসএস ২২	দেশের সর্বত্রই
	বাউ আম-১০ (২৮ টন/হেঃ)	মাঝারি গাছ বামন, বছরে ২/৩ বার ফল দেয় টিএসএস ১৮	-
সফেদা	বারি সফেদা-১ (২৮ টন/হেঃ)	অপেক্ষাকৃত বড় গোলাকার এবং নিয়মিত ফল ধারণকারী উচ্চ ফলনশীল জাত	সমগ্র বাংলাদেশের জন্য উপযোগী।
	বারি সফেদা-২ (২৬ কেজি/গাছ) (৮ বছরের গাছ)	বছরে দুইবার ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত	বাংলাদেশের মধ্য অঞ্চল বিশেষত ঃ ঢাকা, টাঙ্গাইল গাজীপুর, নরসিংদী এর জন্য উপযোগী।
	বাউ সফেদা-১ (১৫-২৩৫ টন/হেঃ)	গাছ ঝোপালো ও বামন প্রকৃতির; অত্যন্ব মিষ্টি ও রসালো টিএসএস ২১-২৪)	-
বাতাবি লেবু	বারি বাতাবী লেবু-১ (১২০ কেজি/গাছ)	নিয়মিত প্রচুর ফলদানকারী মাঝ মৌসুমী জাত	বাংলাদেশের সব অঞ্চলের জন্য উপযোগী।
	বারি বাতাবী লেবু-২ (৩৪ কেজি/গাছ)	মাঝ-মৌসুমী লালচে শাঁস বিশিষ্ট উচ্চ ফলনশীল জাত	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।
	বারি বাতাবী লেবু-৩ (১০৫টি ফল/গাছ)	উচ্চ ফলনশীল নাবী জাত	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।
	বাউ জাম্বুরা-২	বরোসাসি, খুব মিষ্ঠি, শ্বাস লালচে ও রসালো এবং হালকা গোলাপী রং এর টিএসএস ২০.৪%	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।
নরিকেল	বারি নারিকেল-১ (১৫ টন/হেঃ)	মাঝারী আকারের উচ্চ ফলনশীল জাত	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।
	বারি নারিকেল-২ (১৯ টন/হেঃ)	বৃহদাকারের ফল উৎপাদনকারী উচ্চ ফলনশীল জাত	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।

ফলের নাম	জাত এবং ফলন	উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যবলী	চাষ উপযোগিতা
লেবু	বারি লেবু-১ (১৫০ টি ফল/গাছ)	এলাচি ঘ্রান বিশিষ্ট উপবৃত্তকার আকৃতির	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।
	বারি লেবু-২ (১৮৬ টি ফল/গাছ)	ক্ষুদ্র গোলাকার বছরব্যাপী ফল উৎপাদনকারী উচ্চ ফলনশীল জাত	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।
	বারি লেবু-৩ (২১০ টি ফল/গাছ)	নিয়মিত ফল ধরে, ফল গোলাকার ও উচ্চ ফলনশীল	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।
জামরুল	বারি জামরুল-১ (১৪০০টি ফল/গাছ)	ফল দেখতে আকর্ষণীয়, মেরুন বর্ণের এবং খেতে সুস্বাদু	জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য উপযোগী
	বাউ জামরুল-২ (৩০-৪০ টন/হেঃ)	ফল আপেলের মত লাল, থোকায় ২-১০টি ফল থাকে, মিষ্টতা ১০-১২%।	-
আমড়া	বারি আমড়া-১ (২৫০টি ফল/গাছ)	উচ্চ ফলনশীল ও সারা বছর ফল দেয়	জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য উপযোগী
পেঁপে	শাহী (৪৫ কেজি/গাছ)	উচ্চ ফলনশীল মাঝারী আকারের গাছ, ফল সু-স্বাদু এবং শাঁসের রং গাঢ় কমলা লাল	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য উপযোগী
কলা	বারি কলা-১ (৬২.৫ টন/হেঃ)	উচ্চ ফলনশীল কলার রং উজ্বল হলুদ এবং খেতে সুস্বাদু	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।
	বারি কলা-২ (৩৭.৫ টন/হেঃ)	উচ্চ ফলনশীল আনাজী কলা	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।
কুল	বারি কুল-১ (১৫ টন/হেঃ)	উচ্চ ফলনশীল জাত। ফল আকারে বড়, খেতে খুব মিষ্টি ও সুস্বাদু। বীজ ছোট ও অগ্রভাগ সুচালো।	দেশের উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ রাজশাহী ও খুলনা এলাকায় চাষাবাদের জন্য এ জাতটি খুব উপযোগী।
	বারি কুল-২ (১৯.৫ টন/হেঃ)	উচ্চ ফলনশীল জাত। ফল আকারে বড় ও ডিম্বাকৃতি, খেতে সুস্বাদু। বীজ ছোট এবং ডিম্বাকৃতি।	দেশের উত্তরাঞ্চলে চাষাবাদের জন্য উপযোগী তবে দেশের অন্যান্য এলাকায়ও চাষ করা যায়।
	বাউকুল-১	উচ্চ ফলনশীল জাত। ফল আকারে বড় ও ডিম্বাকৃতি, খেতে সুস্বাদু,মিষ্টতা ১৮-২১।	-

* উন্নত জাতের ফলের চারা/কলম ও সবজি বীজ সরকারি/বেসরকারি মান সম্পন্ন নার্সারী/প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা উচিত। এ ব্যাপারে এলাকায় কর্মরত কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী বা উপজেলা কৃষি দপ্তরের সহযোগীতা নেয়া যেতে পারে।


চিত্র ঃ বারি বাতাবি লেবু-৪


চিত্র ঃ বারি আমড়া-১


চিত্র ঃ বাউ পেয়ারা-৬

চারা রোপণ কৌশল

চারা রোপণের জন্য নির্বাচিত স্থানটি ভালভাবে পরিস্কার করে নিতে হবে। চারা রোপণের জন্য নির্ধারিত আয়তনের একটি গর্ত খনন করতে হবে। গর্ত খনন করার পর নিচের মাটি একদিকে এবং উপরের মাটি অন্যদিকে রাখতে হবে। মাটির সাথে প্রয়োজনীয় সার দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। সবল সতেজ রোগমুক্ত চারা নির্বাচন করতে হবে। সাবধানে পলিব্যাগটি অপসারণ করতে হবে যাতে চারার গোড়ার মাটির চাকা ভেঙ্গে না যায়। গোড়ার মাটির চাকা সমেত সযত্নে চারাটিকে গর্তে বসিয়ে ভালভাবে চেপে ঠেসে দিতে হবে। বীজতলায় চারাটি যতটুকু অংশ মাটির নিচে ছিল রোপণের সময় ঠিক ততটুকু অংশ মাটির নিচে রাখতে হবে। রোপণের পর চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে। চারা যাতে হেলে না পড়ে সে জন্য শক্ত খুঁটির সাথে চারা বেঁধে দিতে হবে। খাঁচা দিয়ে চারাকে গবাদি পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে।

পরিচর্যা

চারা রোপণের পর গোড়া থেকে ১ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত কোন নতুন ডাল গজালে তা নিয়মিত ভেঙ্গে দিতে হবে। কলমের গাছের বয়স ৩ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকল ভেঙ্গে দিতে হবে। গাছের অভ্যন্তরে যাতে সূর্যের আলো, বাতাস চলাচল করতে পারে এমন অবস্থা তৈরির জন্য কিছু ডালপালা ছেটে দিতে হবে। সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে (সারণী-২)। চারা রোপনের পর গাছের বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সেচ দেয়া প্রয়োজন। মুকুল বের হওয়ার ৩-৪ মাস আগে থেকে গাছে পানি সেচ দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে।

সারনী - ২ ঃ ফল গাছের চারা/কলম রোপণের সময়, দুরত্ব, গর্তের আকার ও সারের মাত্রা

ফলের নাম	কলম বীজের চারা	রোপনের সময়	রোপন দুরত্ব (মিটার)	হেক্টরপ্রতি চারার সংখ্যা	গর্তের আকার (সেমি)	প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ			
						জৈব সার (কেজি)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)
আম	কলমের চারা	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন	৮-১০	১৫৬-১০০	১০০×১০০×১০০	২০-২৫	২৫০	২৫০	২৫০
পেয়ারা	বীজ/কলমের চারা	মধ্য জ্যৈষ্ঠ-মধ্য আশ্বিন	৪-৫	৬২৫-৪০০	৫০×৫০×৫০	১০-১৫	২৫০	২৫০	-
লেবু	কলমের চারা	বৈশাখ-মধ্য আশ্বিন	২.৫-৩	১৬০০-১১১১	৫০×৫০×৫০	১০-১৫	২৫০	২৫০	-
বাতাবী লেবু	কলমের চারা	মধ্য জ্যৈষ্ঠ-মধ্য আশ্বিন	৫-৬	৪০০-২৭৮	৭৫×৭৫×৭৫	১০-১৫	২৫০	২৫০	-
কুল	বীজ/কলমের চারা	জ্যৈষ্ঠ আশ্বিন	৬-৭	২৭৮-২০৪	১০০×১০০×১০০	১০-১৫	২৫০	২৫০	-
কামরাঙ্গা	বীজ/কলমের চারা	জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন মাস	৬-৭	২৭৮-২০৪	১০০×১০০×১০০	১০-১৫	২৫০	২৫০	-
আমড়া	বীজের চারা	মধ্য জ্যৈষ্ঠ-মধ্য ভাদ্র	৮-১০	১৫৬-১৮০	১০০×১০০×১০০	১০-১৫	২৫০	২৫০	-



চিত্র ঃ বারি আম-৩

সারণী-৩ ঃ ফল গাছের সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা

ফলের নাম	সারের পরিমাণ (গাছপ্রতি)					সার প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতি	সেচ ব্যবস্থাপনা
	বয়স (বছর)	গোবর/জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)		
আম	০২-০৫	১০-১৫	২৫০	২৫০	১০০	সার দুইবারে ফল সংগ্রহের পর জুন-জুলাই মাসে এবং বর্ষার শেষে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রয়োগ করতে হয়। সার গাছের চর্তুদিকে নালা করে অথবা ছিটানো পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায়।	গাছ লাগানোর পর বয়স ভেদে ৩ দিন থেকে ২ সপ্তাহ পর পর ৫ বছর পর্যন্ত পানি দেয়া দরকার। তবে পূর্ণ বয়স্ক গাছের জন্য শুস্ক মৌসুমে ২ বার বেসিন পদ্ধতিতে সেচ দিতে হয় প্রথম বার ফুল ফুটার পর ও দ্বিতীয় বার ফল মটর দানার আকারের সময়। ফুল আসার ২-৩ মাস আগে সেচ দেয়া ঠিক নয়।
	০৬-১০	১৬-২৫	৫০০	২৫০	২৫০		
	১১-১৫	২৬-৩০	১০০০	৫০০	৩৫০		
	১৬-২০	৩১-৪০	১৫০০	৭৫০	৪৫০		
	২০ এর অধিক	৪১-৫০	২০০০	১০০০	৫০০		
পেয়ারা	১	১০	১০০	২৫০	১০০	সার দুই কিস্তিতে মার্চ-এপ্রিল মাসে একবার এবং বর্ষার শেষে সেপ্টেম্বর মাসে আরেকবার জমি কুপিয়ে ছিটানো পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয়।	ছোট গাছে বছরে ৮-১০ বার পানি দিতে হয়। বয়স্ক ফলন্ত গাছে ডিসেম্বর মাস থেকেই ১০ দিন অন্তর ঢালাও অথবা বেসিন পদ্ধতিতে সেচ দিতে হয়।
	২-৩	১৫	২৫০	২৫০	২৫০		
	৪-৫	২০	৫০০	৫০০	৫০০		
	৬ বা উর্ধ্বে	২৫	৫০০	৫০০	৫০০		
কামরাঙ্গা	ছোট গাছ	১০-২০	২৫০-৫০০	২৫০	২৫০-৫০০	বর্ষার আগে ও পরে দুই কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।	খরা মৌসুমে ১৫ দিন অন্তর পানি সেচ দিতে হয়।
	পূর্ণ ফলবান গাছ	৩০-৪০	১০০০	৫০০	১০০০		



চিত্র ঃ কামরাঙ্গা গাছ

ফলের নাম	সারের পরিমাণ (গাছপ্রতি)					সার প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতি	সেচ ব্যবস্থাপনা
	বয়স (বছর)	গোবর/জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমপি (গ্রাম)		
আমড়া	২-৫	১৫	২৫০	২০০	১০০	বর্ষার আগে ও পরে দুই কিস্তিতে কুপিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে।	ফলন্ত গাছে শুস্ক মৌসুমে ৭-১০ দিন পর পর আম গাছের ন্যায় পানি সেচ দিতে হয়।
	৬-১০	২৫	৫০০	৫০০	২৫০		
	১১ বা উর্ধ্বে	৪০	১০০০	৮০০	৪০০		
লেবু জাতীয় গাছ	১-২	১৫	২০০	২০০	২০০	গোবর বা কম্পোষ্ট বর্ষার শুরুর আগে এবং রাসায়নিক সার সেপ্টেম্বর, ফেব্রুয়ারি ও মে মাসে তিন বারে জমিতে ছিটানো পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়।	ফল আসার পর থেকে ১৫ দিন অন্তর পানি সেচ দেয়া প্রয়োজন। ঢালাও, বেসিন অথবা নালা পদ্ধতিতে পানি সেচ দেয়া যায়।
	৩-৫	২০	৪০০	৩০০	৩০০		
	৬ বা উর্ধ্বে	২৫-৪০	৫০০	৪০০	৪০০		
কুল	১-৩	১০	২৫০	২৫০	২৫০	বর্ষার আগে ও পরে দুই কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।	খরা মৌসুমে প্রতি সপ্তাহে একবার নালা করে বা ঢালাও পদ্ধতিতে সেচ দেয়া দরকার।
	৪-৬	২০	৫০০	৫০০	৫০০		
	৭-৯	৩০	১০০০	৭৫০	৭৫০		
	১০ বা উর্ধ্বে	৪০	১২৫০	১০০০	১০০০		

সারণী-৪ ঃ ফল গাছের প্রধান প্রধান রোগ ও দমন ব্যবস্থাপনা

ফলের নাম	রোগের নাম	রোগের লক্ষণ	দমন ব্যবস্থাপনা
আম	এ্যানথ্রাকনোজ	এ রোগের আক্রমণে পাতা, কান্ড, ফুল ও ফলের উপর বাদামী বা ধুসর রঙের ফোস্কা দাগ পড়ে। এতে ফুল ও ফল ঝরে যায় এবং আক্রান্ত ফল পচে যায়।	ডাইথোন এম-৪৫ (০.২%) অর্থাৎ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিমি হারে মিশিয়ে অথবা বর্দোমিশ্রন (১%) অর্থাৎ প্রতি লিটার পানিতে ১০ গ্রাম তুঁতে ও ১০ গ্রাম চুন ব্যবহার করতে হবে।
লেবুজাতীয় ফল	ডাইব্যাক	আক্রান্ত গাছের পাতা ঝরে যায় এবং কচি ডালা আগা থেকে শুকিয়ে মরে যেতে থাকে।	১। আক্রান্ত ডাল কেটে ফেলা এবং কর্তিত অংশে বর্দোপেষ্ট লাগানো। ২। আক্রান্ত গাছে ডাইথেন এম-৪৫ (০.২%) অথবা বর্দোমিশ্রন (১%) স্প্রে করা।
কুল	পাউডারী মিলডিউ	গাছের পাতা, ফুল ও কচি ফলে সাদা পাউডারের মত বস্তু দেখা যায় এবং আক্রান্ত ফল গাছ থেকে ঝরে পড়ে।	এ রোগ দেখার পর থিওভিট নামক ছত্রাক নাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

সারণী-৫ ঃ ফল গাছের প্রধান প্রধান পোকা-মাকড় ও দমন ব্যবস্থাপনা

ফলের নাম	পোকার নাম	ক্ষতির ধরণ	দমন ব্যবস্থাপনা
আম	আমের হপার	আম গাছে মুকুল আসার সময় প্রতিটি মুকুলে অসংখ্য হপার নিস্ফ দেখতে পাওয়া যায়। নিস্ফগুলি মুকুলের রস চোষার ফলে মুকুলের ফুল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝরে যায়। এছাড়া নিম্ফগুলি মুকুলের রস চোষার সাথে সাথে আঠালো মধুরস ত্যাগ করে যা মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় আটকে যায়। এই আঠালো পদার্থে ফুলের পরাগরেনু আটকে গিয়ে ফুলের পরাগসংযোগ ক্রিয়া ব্যাপক ভাবে বিঘ্নিত হয়। ফুল ও পাতায় মধুরসে ভূষা ছত্রাক জন্মে ও পরে কালো হয়।	আম গাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে কিন্তু ফুল ফোটার পূর্বেই (পুষ্পমঞ্জরী ছড়ার দৈর্ঘ্য যখন ৫-১০ সেমি) এক বার এবং এর এক মাস পর আর একবার প্রতি লিটার পানির সাথে ১.০ মিলি রিপকর্ড/সিমবুস/ফেনম/ বাসথ্রিন ১০ ইসি অথবা ডেসিস ২.৫ ইসি মিশিয়ে গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।
পেয়ারা	ফলের মাছি পোকা	স্ত্রী মাছি পোকা ফলের খোসার উপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া ফল ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ফল খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।	ফল ছোট অবস্থায় ব্যাগিং করে ফলের মাছি পোকা দমন করা সম্ভব। আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। ফল পাকার এক থেকে দেড় মাস পূর্ব থেকেই ডিপটারেক্স ৮০ এসপি বা ডেসিস প্রতি ১০ দিন পর পর দু বার স্প্রে করতে হবে।
লেবুজাতীয় ফল	পাতার ছোট সুড়ঙ্গ পোকা (সাইট্রাস লিফমাইনার)	এ পোকার ক্ষুদ্র কীড়াগুলো পাতার উপত্বকের ঠিক নীচে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ করে সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। এতে পাতা কুকঁড়ে বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে ঝরে যায় ও অবশেষে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।	গাছে নতুন পাতা গজানোর সময় রগর/পাফেকথিয়ন ৪০ ইসি ২ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা ম্যালাথিয়ন/সুমিথিয়ন ১ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২ বার স্প্রে করতে হবে।
আমড়া	পাতা খেকো পোকা (লিফবিটস)	এ পোকা আমড়ার পাতা খুবই পছন্দ করে। পোকা হলুদ ও বাদামী রঙের ডোরাকাটা থাকে। পাতা খাওয়ায় গাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং ফলন কমে যায়।	লার্ভা অবস্থায় গুচছাকারে থাকার সময় পাতা সহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। পোকার আক্রমন দেখা দেয়ার সাথে সাথে সেভিন ৮৫% ডাব্লিউপি অথবা সুমিথিয়ন/ফলিথিয়ন ৫০ ইসি যথাক্রমে ২ গ্রাম বা ২ মিলি হারে প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে পাতাসহ সমস্ত গাছ ভিজিয়ে এবং গাছের নীচে পড়ে থাকা সমস্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।

সারনী - ৬ ঃ বিভিন্ন ফল চাষের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

ফলের নাম	প্রতি হেক্টরে ব্যয় (টাকায়)	প্রতি হেক্টরে আয় (টাকায়)	আয়-ব্যয়ের অনুপাত
কলা	২৭,৫২৯.০০	৮৯,৮৮৭.০০	৩.২৬ঃ১
পেঁপে	১৭,০৫৯.০০	৩৮,৭৭৫.০০	২.২৭ঃ১
পেয়ারা	৯,৮০৬.০০	৫৬,১১৯.০০	৫.৭২ঃ১
নারিকেল	১,৩১৯.০০	২১,৩৮৬.০০	১৬.২১ঃ১
আম	২৫,০০৮.০০	২,২৫,২২৮.০০	৯.০১ঃ১

ব্যাপক ভিত্তিতে ফলের গাছ রোপন ও সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পরিবারের আয় বাড়িয়ে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব।

বাঁশ চাষ ও বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া বাঁশ চাষের জন্য খুবই উপযোগী বিধায় বাঁশ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাঁশ চাষ ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। অধিক মাত্রায় বাঁশ ব্যবহার করে কাঠ জাতীয় গাছের ব্যবহার কমিয়ে আনা যায়, যা বৃক্ষের কার্বন সংরক্ষণে সহায়তা করতে পারে। বাঁশ চাষ ও বাঁশের আসবাব পত্র তৈরি ও বিপণনে অধিক আয়ের সুযোগ আছে বিধায় ইহা নারীদের অংশ গ্রহণের জন্য খুবই উপযোগী।


চিত্র ঃ বাঁশের ঝাড়

প্রযুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া বাঁশ চাষের অনুকুল। বর্তমানে বাঁশ চাষ ও বাশেঁর উৎপাদন অনেকাংশে কমে গেছে। প্রচলিত মোথা পদ্ধতির তুলনায় কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে সহজে ও কম খরচে বাঁশ চাষ করা যায়। কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে কঞ্চি কলম সংগ্রহ করে বালির বেডে এক সঙ্গে অনেক চারা উত্তোলন করা সম্ভব। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কঞ্চিকলম থেকে চারা তৈরি করে সেই চারা মাঠে/বসতবাড়ির আশে পাশে রোপন করা হয়। সঠিক পদ্ধতিতে চারার পরিচর্যা করে সেই চারা থেকে ৪-৬ বছরের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ বাঁশঝাড় তৈরি হয় এবং বাঁশ আহরণ করা যায়। একটি বাঁশঝাড় থেকে ৩০-৪০ বৎসর পর্যন্ত বাঁশ কাটা যায়। বাঁশঝাড়ের উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক সবল বাঁশ পাওয়া যায় ও এতে বাঁশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

উৎপাদন পদ্ধতি

কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের কঞ্চি থেকে বালির বেডে চারা তৈরি করে চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। ফাল্গুন হতে আশ্বিন মাস (ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি হতে সেপ্টেম্বর) কঞ্চি কলম কাটার উপযুক্ত সময়। সুস্থ ও সবল আকৃতির এক বছরের কম বয়সের বাঁশ নির্বাচন করে কঞ্চির গোড়া হতে বাঁশের গা ঘেঁষে দেড় হাত লম্বা বা ৩-৫ গিট বিশিষ্ট কঞ্চি কলম কাটতে হবে। সংগৃহীত কঞ্চিগুলো নার্সারী বেডে লাগানোর পূর্ব পর্যন্ত পানিতে ভিজিয়ে বা ভেজা চটে মুড়িয়ে রাখতে হবে। অতপরঃ চার ফুট চওড়া ও প্রয়োজন মত লম্বা করে কমপক্ষে ১০ ইঞ্চি পুরু পরিস্কার বালির বেডে কঞ্চিগুলো ২-৩ ইঞ্চি দুরত্বে সারিবদ্ধ ভাবে ৩-৫ ইঞ্চি গভীরে কঞ্চির গোড়া বসিয়ে বালি দিয়ে চেপে দিতে হবে যেন কঞ্চির আগা সোজা উপরের দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। বালির বেডে কঞ্চি রোপনের পর ২০-২৫ দিন পর্যন্ত দিনে ২-৩ বার ঝরণা দিয়ে পানি দিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে কঞ্চিতে নুতন পাতা ও শাখা-প্রশাখা গজাবে এবং কঞ্চি কলমের গোড়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণে শিকড় গজাবে। তখন বেডে ধীরে ধীরে পানি সেচের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। এসময় শিকড়যুক্ত প্রতিটি কলম ৩ ঃ ১ অনুপাতে মাটি গোবর মিশ্রিত পলিথিন ব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে। প্রথম ৭-১০ দিন কলমটি ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। এ সময় নিয়মিত ভাবে দিনে একবার পানি দিতে হবে। অতপরঃ ব্যাগ গুলো সারিবদ্ধ ভাবে বেডে সাজিয়ে রাখতে হবে। মাঠে রোপনের পূর্বে পর্যন্ত বেডের আগাছা বাছাই করে ও পরিমিত পানি দিতে হবে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৫-২০ ফুট দুরত্বে ৩০ সেমি × ৩০ সেমি × ৩০ সেমি গর্ত করে কঞ্চি কলম মাঠে/বসতবাড়ির নির্বাচিত স্থানে লাগিয়ে দিতে হবে।

উন্নত পদ্ধতিতে বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক সুস্থ সবল ও পুষ্ট বাঁশ উৎপাদন করা যায়। চারা, কঞ্চি, মোথা বা অফসেট জমিতে রোপনের পর প্রথম ১-২ বৎসর চিকন ও সরু বাঁশ গজায় যা পরবর্তীতে মরে যায়। এ সকল চিকন ও সরু মরা বাঁশ কেটে অপসারণ করতে হবে।

বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান দিক হচ্ছে বাঁশ ঝাড় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। ময়লা-আবর্জনা, পঁচা ও রোগাক্রান্ত বাঁশ, কঞ্চি, কোঁড়ল ইত্যাদি বাঁশ ঝাড় থেকে নিয়মিত ভাবে অপসারণ করতে হবে। প্রতি বছর ফাল্গুন চৈত্র মাসে হালকা নিয়মিত আগুন দিয়ে ঝাড় এলাকার আবর্জনা/লতা-পাতা পুড়িয়ে দিতে হবে। এরপর, ঝাড়ের গোড়ায় ৪-৬ ইঞ্চি নতুন মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এর ফলে বাঁশ ঝাড়ে প্রচুর নুতন কোড়ল জন্মাবে ও দ্রুত বেড়ে উঠে স্বাস্থ্যবান ঝাড় সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

তিন বছর বয়স থেকে প্রতি বছর ঝাড়ের গোড়ার চারপাশে মাটি কুপিয়ে ১০০-১২৫ গ্রাম ইউরিয়া, সম পরিমান ফসফেট ও ৫০-৬৫ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া, খরা মৌসুমে পরিমিত পানি সেচ দিতে হবে এবং কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। অতিরিক্ত কঞ্চি ও পচা/আঘাতপ্রাপ্তত বাঁশ নিয়মিত ভাবে কেটে ফেলতে হবে। বাঁশের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট জায়গা দরকার হয়, তাই ঝাড় থেকে বাঁশ এমনভাবে কাটতে হবে যেন একটি বাঁশ থেকে অন্যটি ৬-১০ ইঞ্চি দুরে থাকে।

নুতন ও পুরাতন সকল প্রকার বাঁশঝাড় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। মাথাপচা রোগে আক্রান্ত মরা ও পচা বাঁশঝাড় থেকে কেটে পুড়িয়ে ফেলা উচিৎ। এছাড়া, বয়স্ক বাঁশঝাড়ের পুরাতন মোথা সাবল দিয়ে তুলে অপসারণ করলে বাঁশঝাড় অনেকাংশে নুতন জীবন লাভ করে। বাঁশের কোঁড়ল বের হওয়ার পর ৩টি বাঁশঝাড় লাগাতে হবে এবং প্রতি বছর বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ আহরণ করতে হবে। তাহলে, পরিমান ও গুণগত দিক থেকে ভাল বাঁশ পাওয়া যাবে। বাঁশঝাড় থেকে ৩ বছর বয়সের পরিপক্ক বাঁশ কাটতে হবে। কোন ভাবেই ১ বছর বয়সের বাঁশ কাটা যাবে না কারণ এ বাঁশ থেকে নুতন কোঁড়ল গজায়। একটি ঝাড়ে ১০টি বয়স্ক বাঁশ থাকলে ৫-৬টি বাঁশ কাটা যাবে। জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ মাস বাঁশ গজানোর মৌসুম, এ সময়ে বাঁশ কাটা যাবে না কারণ এতে সদ্যজাত কোঁড়ল ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা থাকে। কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত বাঁশ কাটার উপযুক্ত সময়। বাঁশঝাড়ে যে বছর ফুল ও বীজ হয় সে বছর ঝাড়ের বাঁশ কাটা উচিৎ নয় কারণ, বাঁশে ফুল হলে ঝাড়ের সব বাঁশ মরে যায়। পাকা বীজ থেকে বাঁশের চারা তৈরি করে নুতন বাঁশ বাগান করা যায়। তাই বীজ সংগ্রহের পর বাঁশ কেটে ফেলুন।

বাঁশ চাষ পরিবেশের উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না। বরং বাঁশ চাষের ফলে মৃত্তিকার পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ঢালু ভূমি ও নদীর ধারে ভূমিক্ষয় রোধে সহায়তা করে, বিভিন্ন কাজে বাঁশ ব্যবহারের ফলে বৃক্ষ জাতীয় কাঠের উপর চাপ কম হবে। পরিবেশের শ্রীবৃদ্ধিতে বাঁশের রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। বাঁশ চাষ ও বাঁশের আসবাবপত্র তৈরি ও বিপণনে অধিক আয়ের সুযোগ আছে বিধায় ইহা নারীদের অংশ গ্রহণের জন্য খুবই উপযোগী।

উৎপাদন সরঞ্জাম ও লাভ ক্ষতির বিবরণ

বাঁশ চাষাবাদে খুব বেশি মুলধনের প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতির চাষাবাদে প্রধান উৎপাদনের সরঞ্জাম হচ্ছে কঞ্চি কলম, বীজ, চারা, সার, এ-ফ্রেম, দা, কোদাল, খন্তা ইত্যাদি। প্রতি হেক্টর জমির চাষাবাদে প্রথম ৫ বৎসরের জন্য প্রাথমিক মূলধন ৫-১০ হাজার টাকা ও পরবর্তীতে ৫-৮ হাজার টাকা প্রয়োজন হয়।

একটি বাঁশঝাড় উত্তোলনের প্রথম ৪ বৎসর কোন উৎপাদন হয় না, তবে ৫ম বর্ষে ৩টি বাঁশ সংগ্রহ করা যায়। পরবর্তী প্রতি বৎসরে ১টি করে বাঁশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এইভাবে ১০ম বর্ষে প্রতি ঝাড় থেকে ৮টি বাঁশ কাটা যায়। এর পরের বৎসরগুলোতে একই হারে বাঁশ উৎপাদন হতে থাকে।

একটি বাঁশঝাড় উত্তোলনে প্রথম ৫ বৎসরে খরচ হয় ১৪০.০০ টাকা এবং ৫ম বর্ষে গড়ে ৩টি বাঁশের বিক্রয় বাবদ আয় × ১০০.০০=৩০০.০০ টাকা। ৬ষ্ঠ বৎসরে ৪টি বাঁশের বিক্রয় বাবদ আয় ৪ × ১০০.০০= ৪০০.০০ টাকা; ৭ম বৎসরে ৫টি বাঁশের বিক্রয় বাবদ আয় ৫ × ১০০.০০= ৫০০.০০ টাকা; ৮ম বৎসরে ৬টি বাঁশের বিক্রয় বাবদ আয় ৬ × ১০০.০০= ৬০০.০০ টাকা; ৯ম বৎসরে ৭টি বাঁশের বিক্রয় বাবদ আয় ৭ × ১০০.০০=৭০০.০০ টাকা এবং ১০ম বৎসরে ৮টি বাঁশের বিক্রয় বাবদ আয় ৮ × ১০০.০০=৮০০.০০ টাকা। এইভাবে ১০ম বৎসরে মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০০.০০ টাকা।

প্রাণিসম্পদ উপখাত

উন্নত পদ্ধতিতে বাছুর পালন

বাছুর উন্নয়নকে সাধারণতঃ পালের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একটি সুস্থ সবল বাছুর খামারের অন্যতম সম্পদ। সুস্থ সবল বাছুরের উৎপাদন নির্ভর করে এর গর্ভাবস্থা থেকে জন্ম পরবর্তী যত্ন ও পরিচর্যার উপর। উন্নত পদ্ধতিতে বাছুর পালন প্রযুক্তিটি একটি বাছুরের জন্মের পূর্ব থেকে তার মায়ের পেটের সময় ও জন্ম দৈহিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করে লাভবান হওয়া যায়। গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা যাদের বাড়িতে গাভী পালনের নূন্যতম সুবিধা আছে অথবা বর্তমানে ২/১টি বাছাইকৃত দেশী বা শংকর জাতের গাভী পালন করছেন এবং যার একটি গাভী বা বকনা বর্তমানে কমপক্ষে ৭-৮ মাস (কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে) গর্ভবর্তী তাদের জন্য এ প্রযুক্তি প্রয়োজন হবে।



চিত্র ঃ উন্নত পদ্ধতিতে বাছুর পালন

জাত ও বৈশিষ্ট্য

ভাল বাছুর পাওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে ভাল জাতের সুস্থ সবল গর্ভবর্তী মা বাছাই করা। সংকর জাতের ফ্রিজিয়ান কিংবা দেশী মাদারীপুরি/পাবনাই জাতের ৭-৮ মাসের গর্ভবর্তী গাভী নির্বাচন/বাছাই করতে হবে। এই জাতের গাভীগুলিই এদেশীয় আবহাওয়ার বিশেষ উপযোগী এবং দৈনিক ৪-৫ কেজি দুধ দেয় এই জাতের বকনা ১৮ মাসেই গর্ভ ধারণ করে।

পালন পদ্ধতি

গর্ভাবস্থার শেষের তিনমাসে গাভীকে প্রয়োজনীয় খাবার বিশেষত প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার খাবার ও সবুজ ঘাস দিতে হবে। এ সময়ে গাভীকে হালচাষ বা কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। গাভীকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। জন্মের সাথে সাথে বাছুরকে পরিস্কার করে নাভি থেকে ২ ইঞ্চি দুরে নাড়ী কেটে দিতে হবে। বাছুরকে দ্রুত শাল দুধ খাওয়াতে হবে। জন্মের সময় একটি দেশীয় বাছুর ১৪-১৮ কেজি এবং সংকর জাতের বাছুর ২৫-৩৫ কেজি ওজন হয়ে থাকে।

বাসস্থান

বাছুরের জন্য সাধারণতঃ প্রথম চারমাস আলাদা ঘরের প্রয়োজন হয় না, মায়ের সাথেই তারা থাকতে পারে। বাছুরসহ একটি দেশীয় গাভীর জন্য ৫০-৫৫ বর্গফুট এবং বাছুরসহ সংকর জাতের গাভীর জন্য ৫৫-৬৫ বর্গফুট থাকার জায়গা প্রয়োজন। গাভীর ঘর পিছনের দিকে কিছুটা ঢালু হবে। তাছাড়া খাবার পাত্র/চাড়ী, ড্রেন থাকতে হবে। গাভীর ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস অবশ্যই থাকতে হবে এবং সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বৃষ্টি এবং শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য বেড়া/দেয়ালে চট/চাঁটাই এর পর্দার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাছাড়া শীতকালে মেঝেতে ২-৩ ইঞ্চি পুরু খড় বিছিয়ে দিতে হবে। শীতের প্রকোপ বেশি হলে গাভী ও বাছুরের শরীরে চটের জামা জড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামীণ পর্যায়ে বাঁশ ও কাঠের সাহায্যে অতি সহজেই ঘর নির্মাণ করা সম্ভব। ঘরে খাদ্য ও পরিস্কার পানি সরবরাহ করার জন্য পাত্র রাখতে হবে।

সাধারণ ব্যবস্থাপনা

প্রতিদিন গাভী/বাছুরের ঘরের মেঝে, খাবার পাত্র ও ড্রেইন ভালভাবে পরিস্কার করে কিছু জীবাণুনাশক (যেমন, ব্লিচিং পাউডার (১০ গ্রাম/লিটার) বা ফিনাইল (২০ সেমি/লিটার) পানিতে মিশিয়ে ঘরে স্প্রে করা উচিৎ। প্রতিদিন গরুকে গোসল করাতে হবে। প্রতি মাসে বাছুরের দৈহিক ওজন দেখে বৃদ্ধির হার নির্ণয় করতে হবে। নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ফিতা দিয়ে বাছুর/গাভীর দৈহিক ওজন নির্ণয় করা হয়।

$$\text{গাভী/বাছুরের দৈহিক ওজন নির্ণয়} = \frac{\text{শরীরের দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি)} \times \{\text{বুকের বেড় (ইঞ্চি)}\}\ \text{বর্গ}}{৩০০ \times ২.২} = \text{----}\ \text{কেজি।}$$

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

বাছুর জন্মের প্রথম তিন দিনে বার বার শাল দুধ খাওয়াতে হবে। জন্মের ১ম তিন মাস বাছুরকে প্রতিদিন শরীরের ওজনের ১০ ভাগের ১ ভাগ অথবা ওজনভেদে ২.৫-৩.০ কেজি দুধ অবশ্যই খাওয়াতে হবে। তবে ৬ মাসের মধ্যে বাছুরকে পুরোপুরি দুধ ছাড়িয়ে ফেলতে হবে। একমাস বয়স থেকেই দুধের পাশাপাশি দানাদার খাবার, নরম ঘাস ও প্রক্রিয়াজাত নরম খড় ইত্যাদি সারনী-১নং অনুসারে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে শুধু সবুজ ঘাস অথবা অর্ধেক সবুজ ঘাসের সাথে অর্ধেক ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় দিতে হবে। দানাদার খাদ্য মিশ্রণ তৈরির জন্য সারনী-২ এর উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

সারনী-১ঃ বিভিন্ন বয়স ও ওজনে বাছুরের খাদ্য তালিকা

বাছুরের বয়স (মাস)	সম্ভাব্য ওজন (কেজি)	প্রয়োজনীয় দুধ (কেজি/দিন)	দানাদার (কেজি/দিন)	* শুধু সবুজ ঘাস (কেজি/দিন)	** সবুজ ঘাস + খড়	
					সবুজ ঘাস (কেজি/দিন)	* প্রক্রিয়াজাত খড় (কেজি/দিন)
০	২৫	২.৫০	-	-	-	-
০-১	৪৩	৩.০০	০.৪০	সামান্য পরিমাণ	-	-
১-২	৬১	৩.০০	০.৬০	১.৫০	১.০০	০.৩০
২-৩	৭৯	২.৫০	০.৭৫	৩.০০	১.৫০	০.৬০
৩-৪	৯৭	২.০০	১.০০	৪.০০	২.৫০	১.০০
৪-৫	১১৫	১.৫০	১.০০	৬.৫০	৪.৫০	১.৫০
৫-৬	১৩৩	১.০০	১.৫০	৮.০০	৪.৫০	১.৭৫
৬-৭	১৫১	-	১.৫০	১২.০০	৬.৫০	২.৭৫
৭-৮	১৬৯	-	১.৭৫	১৪.০০	৭.০০	৩.০০
৮-৯	১৮৭	-	২.০০	১৫.৫০	৭.৫০	৩.২০
৯-১০	২০৫	-	২.০০	১৭.৪০	৯.৪০	৩.৫০
১০-১১	২২৩	-	২.২৫	১৮.৫০	৯.৫০	৪.০০
১১-১২	২৪১	-	২.২৫	২১.০০	১০.৫০	৪.৫০

* পর্যাপ্ত ঘাস থাকলে শুধু ঘাস খাওয়ানো যায়।

** ঘাসের পরিমাণ কম থাকলে সারনী ২ ও ৩ নং কলামের অনুপাতে ঘাস এবং ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

সারনী-২ ঃ দানাদার খাদ্য মিশ্রণ

উপাদান	মিশ্রণ-১ (%)	মিশ্রণ-২ (%)
ভুট্টা ভাঙ্গা	৫৫.০০	৫৫.০০
চালের কুড়া (তুষ ছাড়ানো)	২৫.০০	৩৪.৫০
ডালের ভূষি	৯.৫০	-
খৈল	১০.০০	১০.০০
লবন	১.৫০	০.৫০

সারনী-৩ ঃ ইউরিয়া খড় তৈরি

খড় (১০০ কেজি)	পানিতে ইউরিয়া গুলে নেয়া
পানি ১০০ লিটার	খড়ের সাথে ইউরিয়া মেশানো পানি মিশিয়ে পলিথিন দিয়ে ঢেকে বায়ুরুদ্ধাবস্থায় ১২-১৫ দিন রাখা।
ইউরিয়া ৫ কেজি	প্রক্রিয়াজাত খড় হালকা শুকিয়ে বাছুরকে খাওয়ানো।

দ্রষ্টব্য ঃ ১নং সারনীর ভিত্তিতে প্রতি ২ মাসের জন্য সারনী -৩ অনুসারে প্রক্রিয়াজাত খড় তৈরি করে সংরক্ষণ করতে হবে।

সারনী-৩ ঃ গাভী/বাছুরের স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

রোগের নাম	প্রতিরোধ ব্যবস্থা
কাটা, পোড়া, ঘা, আঘাত ইত্যাদি	প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।
পেট ফাঁপা, বদ হজম	পেট ফাঁপা, বদ হজুম প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।
উদরাময়, পাতলা পায়খানা	বাছুরকে সালফার জাতীয় ঔষধ খাওয়ানো যেতে পারে। দূর্বলতার জন্য স্যালাইন বা গ্লুকোজ ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।
সর্দি, কাশি	সালফার জাতীয় টেবলেট, সালফার ডায়াজিন, ডেসাডিন, ট্রিনামাইড খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়।
আঁটালী ও উকুন	ম্যালাথিয়ন ০.৫% বা অন্য কোন কীটনাশক দ্রবণে আক্রান্ত বাছুরকে গোসল করাতে হবে। খামারের সকল গবাদি পশুকে এক সাথে চিকিৎসা দিতে হবে।
কৃমি (ক) সুতা কৃমি, পাতা কৃমি, ফিতা কৃমি ও কেঁচো কৃমি (খ) সব ধরনের কৃমি	(ক) ১ম মাত্রা ৭-১০ দিন বয়সে এবং ২১-৩০ দিনের মধ্যে ২য় মাত্রা। হেলমক্স, এন্ডোকিল বড়ি প্রতি ৪০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১বড়ি (৫ গ্রাম) সকালে খালি পেটে খাওয়াতে হবে। (খ) গর্ভবর্তী গাভী/বাড়ন্ত বাছুর ৬ মাস বয়সের উর্ধে, নাভাডেক্স (৫ গ্রাম) বড়ি প্রতি ৭০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১ বড়ি সকালে খালি পেটে খাওয়াতে হবে।
ক্ষুরা রোগ (Foot & mouth disease)	মুখে ও পায়ে এক সাথে ঘা বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ফিটকারীর গুড়া পানিতে মিশিয়ে ভাল করে মুখ ও পায়ের ঘা ধুয়ে দিতে হবে। মনোভ্যালেন্টন টিকা (বাছুরের জন্য ৩ মিলি)/বাইভ্যালেট টিকা (বাছুরের জন্য ৬ মিলি); চার মাসের কম বয়সী বাছুরের টিকা দেয়া হয় না।
গলাফুলা (Haemorrhagic seplicaenic)	গলা ও জিহবা ফুলে যায়। শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়। অস্কি টিটাসাইকিলিন ১ মিলি/১০ কেজি ওজনের দেহের বাছুরের মাংসে প্রয়োগ করতে হবে। বাছুরের বয়স ১৩৫ দিন হলে প্রতি ৬ মাস পর।
তড়কা (Anthrax)	তীব্র সংক্রামক রোগ, বাছুরের বয়স ৯০ দিন হলে ১ম বার টিকা দিতে হবে।
বাদলা রোগ	বাছুরের বয়স ১২০ দিন হলে প্রতি ৬ মাস পর টিকা দিতে হবে।

সারনী - ৪ ঃ বাছুর পালনে এক বছরের প্রাক্কলিত ব্যয়, আয় ও মুনাফার হিসাব

ব্যয়ের খাত	টাকা (দেশীয় বাছুর)	টাকা (সংকরজাত বাছুর)
বাছুরের দাম	খামারীর নিজস্ব ধর্তব্য মূল ৮,০০০.০০	খামারীর নিজস্ব ধর্তব্য মূল ১২,০০০.০০
খাদ্য খরচ*	১৭,০০০.০০	২০,০০০.০০
ভেটেনারী সার্ভিস	১,০০০.০০	১,০০০.০০
অন্যান্য খরচ	৫০০.০০	৫০০.০০
মোট ব্যয়	২৬,৫০০.০০	৩৩,৫০০.০০

আয়ের খাত	টাকা (দেশীয় বাছুর)	টাকা (সংকরজাত বাছুর)
১ বছর বয়সী দেশি বাছুরের ওজন ১৭০ কেজি এবং সংকরজাত বাছুরের ওজন ২২০ কেজি হবে	দেশি ষাড় বাছুর বিক্রয় ৩৪,০০০.০০	সংকরজাত ষাড় বাছুর ৪৬,৫০০.০০
	দেশি বকনা বাছুর বিক্রয় ৩৫,০০০.০০	সংকরজাত বকনা বাছুর ৪৮,৫০০.০০
গোবর বিক্রয়	১,৫০০.০০	১,৫০০.০০
মোট আয়	দেশি ষাড় বাছুর + গোবর ৩৫,৫০০.০০	সংকরজাত ষাড় বাছুর + গোবর ৪৮,০০০.০০
	দেশি বকনা বাছুর + গোবর ৩৬,৫০০.০০	সংকরজাত বকনা বাছুর + গোবর ৫০,০০০.০০
বছর শেষে মুনাফা (খ-ক)	দেশি ষাড় বাছুর ৯,০০০.০০	সংকরজাত ষাড় বাছুর ১৪,৫০০.০০
	দেশি বকনা বাছুর ১০,০০০.০০	সংকরজাত বকনা বাছুর ১৬,৫০০.০০

দ্রষ্টব্য ঃ ১ দিন বয়সের বাছুর পালনের ক্ষেত্রে ২য় বছরেও একই পদ্ধতিতে পালন ও বিক্রয় হবে বিধায় লাভের অংকে খুব বেশি তারতম্য হবে না।

এক বছর অর্থাৎ ৩৬৫ দিনের খাদ্যের পরিমাণ ও ব্যয়

ক) দানাদার (প্রতিদিন গড়ে ১.৪২ কেজি × ৩৬৫ কেজি × ২০ টাকা/কেজি) = ১০,৩৬৬ .০০ টাকা

খ) সবুজ ঘাস (প্রতিদিন গড়ে ৭.২০ কেজি × ৩৩৪ দিন × ১.৫০ টাকা/কেজি) = ৩,৬০০.০০ টাকা

গ) প্রক্রিয়াজাত খড় (প্রতিদিন গড়ে ২.৩৭ কেজি × ৩৩৪ দিন × ২ টাকা/কেজি) = ৩,১৬৬.০০ টাকা

মোট ঃ ১৭,১৩২.০০ টাকা

গরু মোটাতাজাকরণ

গরু মোটাতাজাকরণ বলতে অল্প সময়ে পরিকল্পিত ভাবে খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গরুর মাংস ও চর্বি বৃদ্ধি করে বাজারজাত করানোকে বুঝায়। এক্ষেত্রে সাধারণত নিরোগ অথচ খাদ্যাভাবে তুলনামূলকভাবে কমস্বাস্থ্যবান বাড়ন্ত বা বয়স্ক গরু ব্যবহার করা হয়। একজন সুফলভোগী এর মাধ্যমে তার আয় বৃদ্ধি সহ কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারেন।



চিত্র ঃ মোটাতাজাকরণকৃত সংকরজাতের ষাড় বাছুর

খামারী নির্বাচন

বাড়িতে গরু পালনের অভিজ্ঞতা আছে এবং কিছু পরিমাণ খাদ্য নিজস্বভাবে সরবরাহ করার সামর্থ আছে এমন মহিলা, কৃষক/কৃষানী, বেকার যুবক এ প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারে।

পালন পদ্ধতি

পালন কালঃ দুই থেকে চার বছর বয়সী অপেক্ষকৃত হালকা পাতলা ষাড় গরু বা বয়স্ক গরু মোটাতাজাকরণের জন্য ৩-৪ মাস সময়ের প্রয়োজন হয়। এর বেশি দিন রাখলে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভ কমে যায়।

বাসস্থান

রাতে এবং দিনের অধিকাংশ সময় গরুকে ঘরে রেখে পালনের জন্য গরু প্রতি ৩৫-৪০ বর্গ ফুট জায়গার প্রয়োজন। উক্ত স্থানে গরুর খাবার চাড়ী সহ শোয়া/বসা/দাড়ানোর স্থান এবং গরুকে খাদ্য সরবরাহ এবং গরুকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এ জন্য গরুকে আলাদা গোয়াল ঘরে রাখা উত্তম, যেখানে পর্যাপ্ত আলো বাতাস থাকবে এবং চুরি হওয়ার সম্ভবনা কম থাকবে। গোয়াল ঘরের মেঝে একদিকে ঢালু হবে এবং সম্ভব হলে ইট বিছিয়ে দিতে হবে। গোয়াল ঘরটি একচালা বা দোচালা হতে পারে তবে তা সুবিধাজনক টেকসই এবং কম খরচে হতে হবে।

উপযুক্ত জাত ও বয়সের গরু নির্বাচন

আমাদের দেশে সাধারণত দেশি গরু এবং সংকর জাতের গরু পাওয়া যায়। মোটাতাজা করার জন্য দেশি এবং সংকর জাতের ষাঁড়/বলদ ব্যবহার করা যেতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই ষাঁড় বলদ সকল প্রকার রোগমুক্ত হতে হবে, তবে খাদ্যাভাবে তা কম স্বাস্থ্যবান হতে পারে। সাধারণতঃ গরুটি আকারে লম্বাটে, প্রশস্ত পাঁজর, উজ্জল চোখ, সোজা শিরদাঁড়া বিশিষ্ট হবে।

কৃমি মুক্তকরণ

বাংলাদেশের প্রায় সকল গরুই কৃমি আক্রান্ত। এজন্য মোটাতাজাকরণের জন্য সংগৃহীত গরুকে প্রথমেই কৃমি মুক্ত করতে হবে। এজন্য ১ নং সারণী প্রদত্ত কৃমির ঔষধের যে কোন একটি কৃমিনাশক গরুর ওজন ও মাত্রা অনুসারে খাওয়াতে হবে। প্রথম বার খাওয়ানোর ১০-১২ দিনের মাথায় ২য় মাত্রায় কৃমির ঔষধ খাওয়াতে হবে।



চিত্র ঃ কৃমিমুক্ত গরু

টিকা প্রদান

যেহেতু গরুকে মোটাতাজাকরণের জন্য মাত্র ৩-৪ মাস রাখা হয় সে জন্য তিনটি সংক্রামক রোগের জন্য গরুকে টিকা প্রদান করতে হয়। রোগগুলো হলো ক্ষুরা, তড়কা এবং বাদলা। গরুকে আনার পরপরই প্রথমে পলি ভেলেন্ট (Poly Velent) ক্ষুরা রোগের টিকা দিতে হবে। এর ১৫ দিন পর পর যথাক্রমে তড়কা (Anthrax) এবং বাদলা (Black Quarter) রোগের টিকা দিতে হবে। এসব টিকা পশু সম্পদ কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করে পশু সম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ কর্মীর মাধ্যমে বা প্যারাভেটের মাধ্যমে উক্ত টিকা দেয়া যেতে পারে।

সারনী-১ ঃ বিভিন্ন ওজনের গরুর জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার কৃমিনাষক

গরুর ওজন (কেজি)	কৃমিনাষকের মাত্রা	ঔষধের নাম
৭৫	১টি ট্যাবলেট	এনডেক্স/মেডাল/লিকেক্স, রেনাডেস্ক
১০০	১ + ১/৩টি ট্যাবলেট	
১২৫	১+১/২টি ট্যাবলেট	
১৫০	২টি ট্যাবলেট	
১৭৫	২+১/৩টি ট্যাবলেট	
২০০	২+১/৩টি ট্যাবলেট	
২৫০	৩+১/৩টি ট্যাবলেট	
৩০০	৪টি ট্যাবলেট	

গরু ওজন করা

মাঠ পর্যায়ের গরুর ওজনের জন্য ফিতার সাহায্যে গরুর দৈর্ঘ্য লেজের পার্শ্বে হাঁড়ের মাথা (Point of Hip) থেকে গরুর সামনের পায়ের পিঠ সংলগ্ন হাঁড়ের মাথা (Point of Shoulder) এবং গরুর বুকের বেড় থেকে নিম্নোক্ত সমিকরণের সাহায্যে ওজন করা যায়।

$$\text{গরুর ওজন (কেজি)} = \frac{\text{গরুর দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি)} \times (\text{গরুর বুকের বেড় ইঞ্চি})^2}{৩০০ \times ২.২}$$

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মোটাতাজাকরণের জন্য গরুকে পর্যাপ্ত পরিমানে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে গরুকে খড়/খাসের পাশাপাশি দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে। সাধারণত প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য ১ কেজি দানাদার খাদ্য প্রদান করা হয়। খড়কে ইউরিয়া দিয়ে বা ইউরিয়া মোলাসেস দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করে তা সরবরাহ করা উচিত। বিভিন্ন ওজনের গরুর জন্য দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্যের তালিকা প্রদান করা হলে (২নং সারণী)

সারনী - ২ ঃ মোটাতাজাকরণের জন্য বিভিন্ন ওজনের গরুর জন্য দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য তালিকা (কেজি/গরু/দিন)

গরুর ওজন	দানাদার খাদ্য	শুধু ইউরিয়া মোলাসাসের স্ট্র (ইউএমএস)	শুধু ইউরিয়া ট্রিটেড স্ট্র (ইউটিএস)	শুধু সবুজ ঘাস	১.১ অনুপাতে ঘাস ও খড়	
					ঘাস	ইউএমএস
৭৫	০.৮	২.৫	২.৫	৬	৩	১.৩
১০০	১.০	৩.৩	৩.৩	৮	৪	১.৭
১২৫	১.৩	৪.২	৪.২	১০	৫	২.১
১৫০	১.৫	৫.০	৫.০	১২	৬	২.৫
১৭৫	১.৮	৫.৮	৫.৮	১৪	৭	২.৯
২০০	২.০	৬.৭	৬.৭	১৬	৮	৩.৩
২২৫	২.৩	৭.৫	৭.৫	১৮	৯	৩.৮
২৫০	২.৫	৮.৩	৮.৩	২০	১০	৪.২
২৭৫	২.৮	৯.২	৯.২	২২	১১	৪.৬
৩০০	৩.০০	১০.০	১০.০	২৪	১২	৫.০

উপরোক্ত ২ নং সারণী অনুসারে গরুকে দানাদার খাবারের পাশাপাশি ইউএমএস বা ইউটিএস বা সবুজ ঘাস অথবা ইউএমএস/ইউটিএস সবুজ ঘাস ১ঃ১ অনুপাতে খাওয়ানো যেতে পারে। পর্যাপ্ত ঘাস থাকলে দানাদার খাবারের সাথে ৩ নং সারণী প্রদত্ত পরিমাণ ঘাস খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

ইউএমএস তৈরি

ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউএমএস) হলো খড়-ইউরিয়া এবং চিটাগুড়ের মিশ্রন যা গরুকে সরাসরি খাওয়ানো যায়।

সারনী - ৩ ঃ ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউএমএস) তৈরির বিভিন্ন উপাদান ও পরিমাণ

উপাদান	পরিমান (কেজি)
শুকনা খড়	১০.০০
ইউরিয়া	০.৩
চিটাগুড়/নালীগুড়	২.২
পানি	৬.০

প্রথমে প্রতিটি উপাদান মেপে নিতে হবে। এরপর পানিতে প্রথমে ইউরিয়া দ্রবিভুত করে তাতে চিটাগুড় ভালভাবে গুলে নিতে হবে। এবার চিটাগুড়-ইউরিয়া মেশানো দ্রবন খড়ে ছিটিয়ে তা ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এভাবে তৈরি ইউএমএস গরুকে সাথে সাথে খাওয়ানো যাবে অথবা দুই দিন পর্যন্ত রেখে খাওয়ানো যাবে, তবে এর বেশি দিন রাখা উচিত নয়। সম্ভব হলে খড়কে কেটে ছোট ১০ সেমি করে দিলে খড়ের অপচয় কম হয়।

ইউটিএস তৈরি

যেখানে চিটাগুড়ের মূল্য বেশি সেখানে বিকল্প হিসাবে ইউটিএস বা ইউরিয়া ট্রিয়েটেড ষ্ট্র খাওয়ানো যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ১৫ দিন ৩০ দিন বা তারও বেশি দিনের জন্য প্রয়োজনীয় খড় এক সাথে প্রক্রিয়াজাত করে নিতে হবে।

সারনী - ৪ ঃ ইউটিএস তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদান ও পরিমাণ

উপাদান	পরিমান (কেজি)
শুকনা খড়	১০০ কেজি
ইউরিয়া	৫ কেজি
পানি	১০০ কেজি
পলিথিন (৭ ফুট ব্যাসের)	২০ গজ

প্রথমে পানি জমে না এরকম জায়গায় ৩৫ সেমি × ১০ সেমি আয়তনের ভিটি তৈরি করতে হবে। তবে বাড়িতে বড় চাড়ী/ডোল/কোন বড় গর্ত থাকলে সেখানেও খড় প্রক্রিয়াজাত করা যায়। প্রথমে ইউরিয়া পানিতে গুলে নিতে হবে। এক স্তর (৫ কেজি) খড় ভিটিতে/চাড়ীতে/ডোলে/গর্তে বিছিয়ে দিয়ে তাতে ইউরিয়া মেশানো পানি খড়ের অনুপাতে (৫ কেজি খড়ের জন্য ৫ লিটার পানি ইউরিয়া দ্রবণ) দিতে হবে। এভাবে স্তরে স্তরে খড় এবং ইউরিয়া দ্রবন দিয়ে পুরো খড় শেষ করে তা পলিথিন পেপার দিয়ে বায়ুরুদ্ধ অবস্থায় ঢেকে দিতে হবে। ১২-১৫ দিন এ অবস্থায় খড়কে প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। এ সময় উক্ত খড়ের গাদার পলিথিন সরানো যাবে না। কোনভাবে পলিথিন যেন ফুটা না হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

১২-১৫ দিন পর গরুর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান প্রক্রিয়াজাত খড় গাদা থেকে বের করে ১/২-১ ঘন্টা খোলা যায়গায় রেখে খড়ের অতিরিক্ত এমোনিয়া দূর করে তা গরুকে দিতে হবে।

দানাদার খাদ্য মিশ্রণ তৈরি

দানাদার খাদ্য তৈরির জন্য স্থানীয়ভাবে সুলভমূল্যে প্রাপ্ত অথচ পুষ্টিগুন সম্পন্ন খাদ্যের উপাদানকে প্রধান্য দিতে হবে। সারণী ৫ এ গরু মোটাতাজাকরনে সম্ভাব্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ দেয়া হলো। এলাকা ও মৌসুম ভিত্তিতে উক্ত মিশ্রনের বাজার মূল্য ১৭-১৯ টাকা হতে পারে।

সারনী - ৫ ঃ গরু মোটাতাজাকরণে সম্ভাব্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ

উপাদান	পরিমাণ	১০ কেজি মিশ্রণের জন্য পরিমাণ (কেজি)
চাল ভাঙ্গা/ভুট্টা ভাঙ্গা	৪০	৪.০
গমের ভুষি/চালের কুড়া (তুষ ছাড়ানো)	৪০	৪.০
তিল/ সরিষা/নারিকেল খৈল	১৮	১.৮
শুটকি মাছে গুড়া	১	০.১
লবণ	১	০.১

ব্যবস্থাপনা

একটি ২০০ কেজি ওজনের গরু দৈনিক প্রায় ১৮-২০ কেজি গোবর এবং ০.৫-১০ কেজি অন্যান্য আবর্জনা উৎপাদন করে। খামারকে লাভজনক করার জন্য উক্ত গোবর ও আবর্জনা কে কম্পোষ্ট করে তা বিক্রি করা যাবে। কম্পোষ্ট করার জন্য পানি জমেনা এ রকম স্থানে গর্ত করে এক স্তর গোবর এবং একস্তর আবর্জনা এভাবে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখতে হবে। এভাবে ২.৫-৩ মাসের মধ্যে কম্পোষ্ট তৈরি হলে তা জমিতে ব্যবহার বা জৈব সার হিসেবে বিক্রি করা যাবে।

বাজারজাতকরণ

গরুকে প্রকল্প শুরুর তিন মাসের মধ্যেই বাজারজাত করতে হবে। যে সকল গরু কাঙ্খিত মাত্রায় (দৈনিক প্রায় ৬০০ গ্রাম) বাড়ছে না (যা ওজন বৃদ্ধির রেকর্ড থেকে বের করা যায়) সে সব গরু তিন মাস পূর্বেই বিক্রি করে দিতে হবে।

আয়-ব্যয়

তিন মাস মেয়াদী ২-৪ বছর বয়সী দেশি/সংকর জাতের গরুর মোটাতাজাকরণ সম্ভাব্য খরচ এবং মোটাতাজাকৃত গরুর সম্ভাব্য দাম এবং সম্ভাব্য নেট মুনাফা নিচে প্রদান করা হলো। এভাবে বছরে ৪টি গরু পালনের মাধ্যমে এ কাজ সফলভোগী ১৭-২০ হাজার টাকা আয় করতে পারেন।

সারনী - ৬ঃ গরু পালনে আয়-ব্যয়ের বিবরণী

খরচের খাত	খরচের খাত গরুপ্রতি তিন মাসে খরচ (টাকায়)	
	দেশি ষাড়	সংকরজাত ষাড়
ষাড় (প্রায় ১৫০ কেজি ওজনের)	১১০০০.০০	১১০০০.০০
খাদ্য (খড়, দানাদার, ঘাস ইত্যাদি)	৪৫০০.০০	৪৮০০.০০
টিকা, ঔষধ ও ডাক্তার	২০০.০০	২০০.০০
ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য অপ্রত্যাশিত খরচ	৪০০.০০	৪০০.০০
মোট খরচ	১৬,১০০.০০	১৬,৪০০.০০
আয়ের খাত	**গরুপ্রতি তিন মাসে আয়**	
ষাড় বিক্রি বাবদ	২০,০০০.০০	২১,০০০.০০
গোবর/কম্পোষ্ট বিক্রি বাবদ	৫০০.০০	৫০০.০০
মোট আয়	২০,৫০০.০০	২১,৫০০.০০
নীট লাভ	**৪,৪০০.০০**	**৫,১০০.০০**

আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল পালন

দেশে মাংসের চাহিদা বাড়লেও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে প্রাণিসম্পদ বিশেষ করে ছাগলের উৎপাদন আশানুরুপ বৃদ্ধি পায় নাই। এ দেশে প্রায় ১৫ মিলিয়ন ছাগলের প্রায় ৭৬ ভাগ পালন করে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরণের খামারীরা। বাংলাদেশেব ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস যেমন সুস্বাদু তেমনি চামড়া উন্নতমানের। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল বাংলাদেশের সব এলাকায় পাওয়া যায়। এদেশে সাধারণত ছেড়ে বা চরিয়ে ছাগল পালন করা হয়।

এ অবস্থায় সাধারণত অপুষ্টি, কৃমি এবং অন্যান্য রোগের কারণে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল তাদের উৎপাদনশীলতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে না। আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলকে চরানোর পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রদান, কৃমি দমন, সংক্রামক (বিশেষত পিপিআর) রোগ দমন, উপযুক্ত বাসস্থান এবং পরিকল্পিত প্রজনন করানো হলে এদের উৎপাদনশীলতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব।



চিত্র ঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল

বাড়িতে ছাগল পালন এবং চরিয়ে বেড়ানোর ন্যূনতম সুবিধা আছে এবং ছাগল পালনে যে পরিবারের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে, আগ্রহ আছে অথবা বর্তমানে ২/১টি ছাগল পালন করছেন, এমন অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল গ্রামীণ মহিলা কৃষক/কৃষাণী পরিবার, বেকার যুবক/যুবতী ছাগল পালন করতে পারেন। আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ছাগল দৈনিক ৫-৬ ঘন্টা চরানো হয়। বাকী সময়ে সাধারণতঃ খামারীর বাড়িতে থাকে।

জাত নির্বাচন

বারো থেকে পনের (১২-১৫) মাস বয়সী ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের স্বাস্থ্যবতী ছাগী নির্বাচন করতে হবে। একবার ৩/৪টি বাচ্চা দিয়েছে এধরনের ছাগলকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে

বাসস্থান

রাতে এবং দিনের কিছু সময়ে বসবাসের জন্য (বিশেষত বৃষ্টির দিনে) ছাগলের আবাসস্থল প্রয়োজন। ২/৩টি বাচ্চাসহ প্রতিটি বয়স্ক ছাগীর জন্য ৪ বর্গ মিটার জায়গা প্রয়োজন। ৪টি ছাগী দিয়ে শুরু করা একটি খামারে ২য় বছরে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২৬টি ছাগল (৬টি ছাগী, ১২টি বাচ্চা, ৪টি খাসি ও ৪টি পাঠি) হতে পারে। এজন্য ৪ মিটার লম্বা ও ২ মিটার চওড়া ছোট একটি ঘরের প্রয়োজন হবে। ঘরে ৫০ সেমি উঁচু বাঁশ/কাঠের অপসারণযোগ্য মাঁচা তৈরি করতে হবে। প্রতিদিন মাঁচা সরিয়ে নিচের ময়লা পরিস্কার করতে হবে। শীতকালে মাঁচার উপর খড় দিতে হবে। আবাসস্থলের দেয়াল বাঁশের তৈরি হলেও চলবে, তবে চাঁটাই বা চটের পর্দা থাকতে হবে। বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন ধরণের ছাগলকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রাখা উচিৎ। পাঁঠাকে সব সময় ছাগী থেকে পৃথক করে রাখা উচিৎ। দুগ্ধবতী, গর্ভবতী এবং শুস্ক ছাগীকে একসাথে রাখা যেতে পারে। তবে বাচ্চা দেওয়ার পর সাত দিন পর্যন্ত ছাগীর সাথে (চরানোর সময় ছাড়া) বাচ্চাকে রাখা উচিৎ। বাড়ন্ত ছাগল ও খাসি একই জায়গায় রাখা যেতে পারে।

বাচ্চা ও বাড়ন্ত ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা জন্মের সাথে সাথে মায়ের শালদুধ খাওয়াতে হবে। ছাগলের বাচ্চা প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১৫০-২০০ গ্রাম শাল দুধ খাওয়াতে হয়। এ পরিমাণ দুধ দিনে ৮-১০ বার খাওয়াতে হবে। শাল দুধ বাচ্চার শরীরে এন্টিবডি তৈরি করে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করে। যে বাচ্চা মায়ের দুধের পরিমাণ কম তাদেরকে বোতলে অন্য ছাগলের দুধ খাওয়াতে হবে। শীতের সময় বাচ্চাকে মায়ের সাথে ব্রুডিং পেনে রেখে ২৫-২৮০ সেঃ তাপমাত্রায় রাখতে হবে। বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে মায়ের দুধ ও চরানোর পাশাপাশি দানাদার খাদ্য নিম্নে সারণী-১ ও সারণী-২ অনুসারে দিতে হবে।

সারনী-১ঃ ছাগল ছানার বয়স ভিত্তিক ঘাস সরবরাহ

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি কেজি ছাগলের জন্য দুধ (গ্রাম)	প্রতি কেজি ছাগলের জন্য দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	কচি ঘাস
০-২	২০০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩-৪	২৫০	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৫-৬	২৫০	২০	সামান্য পরিমাণ
৭-৮	২৩০	৪০	পর্যাপ্ত পরিমাণ
৯-১০	২১০	৬০	পর্যাপ্ত পরিমাণ
১১-১২	২০০	১০০	পর্যাপ্ত পরিমাণ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিস্কার পানি সরবরাহ করা উচিৎ।

সারনী-২ঃ বাড়ন্ত ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ

ছাগলের ওজন	দানাদার খাদ্য দৈনিক সরবরাহ	ঘাস সরবরাহ/চরানো (কেজি)
৪	১০০	০.৪
৬	১৫০	০.৬
৮	২০০	০.৮
১০	২৫০	১.৫
১২	৩০০	২.০
১৪	৩৫০	২.৫
১৬	৩৫০	৩.০
১৮	৩৫০	৩.৫

সবুজ ঘাসের পাশাপশি বাড়ন্ত ও বয়স্ক ছাগলকে ইউরিয়া মোলাসেস/মাড় মেশানো কাটা খড় সারণী-৩ অনুসারে খাওয়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে খড়কে ১ সেমি করে কেটে নিতে হবে। এরপর পানিতে মোলাসেস ও ইউরিয়া গুলে খড়ের সাথে মেশাতে হবে। মোলাসেসের দাম বেশি হলে ভাতের মাড়ের সাথে ইউরিয়া গুলে তা খড়ের সাথে মেশাতে হবে। এ ধরনের মেশানো খড় সাথে সাথেই ছাগলকে খাওয়ানো যায়। তবে এক সাথে সর্বোচ্চ ৩ দিন এই খড় সংরক্ষণ করা যায়। একটি বয়স্ক ছাগল দৈনিক ৩৫০-৫৫০ গ্রাম ইউরিয়া-মোলাসেস বা ইউরিয়া ভাতের মাড় মেশানো খড় খেতে পারে। এজন্য ছাগলকে ধীরে ধীরে খড় খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে।

সারনী-৩ঃ ইউরিয়া মোলাসেস বা ইউরিয়া-ভাতের মাড় মেশানো খড়ের উপাদানের পরিমাণ

ইউরিয়া-মোলাসেস খড়		ইউরিয়া-ভাতের মাড় খড়	
উপাদান	পরিমান (গ্রাম)	উপাদান	পরিমান (গ্রাম)
শুকনো খড়	১০০০	শুকনো খড়	১০০০
মোলাসেস	২০০	ভাতের মাড়	২০০
ইউরিয়া	৩০	ইউরিয়া	৩০
পানি	৫০০ মিলি	-	-

স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধ

ছাগলের সংক্রামক রোগের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো একথাইমা, পিপিআর, গোট পক্স এবং এন্টোরোটক্সিমিয়া। তাছাড়া কোন কোন সময়ে ক্ষুরা রোগও হতে পারে। এসব রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা দিতে হবে।

সারনী-৪ ঃ ছাগলের বিভিন্ন রোগের টিকা দেয়ার সময়

রোগের নাম	টিকা দেয়ার বয়স/সময়						
	২য় দিন	১০-১৫ দিন	৩ মাস	৪ মাস	৫ মাস	৬ মাস	৯ মাস
একথাইমা	১ম ডোজ	২য় ডোজ	-	-	-	-	-
ক্ষুরা রোগ	-	-	১ম ডোজ	বুষ্টার ডোজ	-	-	২য় ডোজ
পিপিআর	-	-	১ম ডোজ	-	-	-	-
গোট পক্স	-	-	-	-	১ম ডোজ	-	-
এন্টারোটক্সিমিয়া	-	-	-	-	-	১ম ডোজ	-

প্রথম ডোজ টিকা প্রয়োগের ২১-৩০ দিনের মধ্যে ২য় বার বুষ্টার ডোজ এবং এর পর থেকে নিয়মিত প্রতি ছয় মাস পর পর দিতে হবে। টিকা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনা স্থানীয় প্রাণি সম্পদ অফিসের সাথে যোগাযোগ করে দিলে ভাল হয়।

কৃমি ও অন্যান্য পরজীবী দমন

খামারের তিন মাসের বেশি বয়সের সকল ছাগলকে প্রতি চার মাস পর পর দীর্ঘ মেয়াদে কার্যকর কৃমিনাশক দিতে হবে।উঁকুন/আঁঠালী/মাইটস প্রতিরোধে প্রতিটি ছাগলকে প্রতি ১৫-৩০ দিন পর পর অন্ততঃ একদিন ০.৫% মেলাথিয়ন দ্রবণ দিয়ে গোসল করাতে হবে। তবে স্বাভাবিক নিয়মে ছাগলের তেমন গোসলের প্রয়োজন হয় না।


চিত্র ঃ ব্ল্যাক বেঙ্গল প্রজাতির বাচ্ছাসহ ছাগল

প্রজনন ব্যবস্থাপনা

পাঠীর বয়স ৮-৯ মাস বা ওজন ১২-১৩ কেজি হলে তাকে পাল দেয়া যেতে পারে। পাঠী বা ছাগীর গরম হওয়ার ১২-১৪ ঘন্টা পর পাল দিতে হবে। পাল দেয়ার ১৪২-১৫০ দিনের মধ্যে ছাগী বাচ্চা দেয়। বাচ্চা দেয়ার ১৫-৩০ দিনের মধ্যে ছাগী পুনরায় গরম হয়। পাল দেয়ার জন্য নির্বাচিত পাঁঠা রোগমুক্ত উন্নত মানের হতে হবে। আন্তঃ প্রজনন এড়াতে বাবা, দাদা বা নাতীকে দিয়ে প্রজনন করানো যাবে না। সম্পর্কহীন অন্য বাড়ির পাঠা দিয়ে পাল দিতে হবে। দশটি ছাগীর জন্য একটি পাঠাই যথেষ্ট।





চিত্র ঃ গ্রামীণ পরিবেশে ছাগল পালন

বাজারজাতকরণ

সুষ্ঠু খাদ্য, স্বাস্থ্য, প্রজনন ও আবাসন ব্যবস্থাপনায় ১২-১৩ মাস বয়সী ছাগী ১৯-২০ কেজি হতে পারে। এ সময় এদের বাজারজাত করতে হবে। বেশি বয়সের খাসী অনেক সময় চর্বি জমে মারা যেতে পারে। চারটি পূর্ণ বয়স্ক ছাগীর খামারের প্রাক্কলিত আয়-ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদান করা হলো।

সারনী - ৫ঃ ছাগল পালনে আয়-ব্যয়ের বিবরণী

(ক) ব্যয়	১ম বছর (টাকা)	২য় বছর (টাকা)
ঘর বানানো খরচ (১২ × ৬) ফুট বাঁশের মাচা সহ	৩,৫০০.০০	
৪টি ছাগী (প্রতি ছাগী ২৫০০.০০ টাকা হিসেবে)	১০,০০০.০০	
১ম বছর: প্রথম ৬ মাস ৪টি ছাগীর দৈনিক ০.২ কেজি হিসাবে মোট (০.৮ ×১৮০)= ১৪৪ কেজি দানাদার; শেষ ৬ মাসে ৪টি ছাগীর (০.২×৪)=০.৮ কেজি এবং বাচ্চা/বাড়ন্ত ৮টি ছাগলের (০.১x৮)=০.৮ কেজি হিসাবে মোট (১.৬×১৮০) =২৮৮ কেজি দানাদার; সর্বমোট বছরে (১৪৪+২৮৮)=৪৩২ কেজি দানাদার প্রতি কেজি ২০ টাকা হিসেবে = ৮,৬৪০ টাকা।	৮,৬৪০.০০	-
২য় বছরঃ সারা বছর ৪টি ছাগী ও ৮টি বাচ্চা/বাড়ন্ত ছাগলের জন্য দৈনিক (০.৮×০.৮ = ১.৬ কেজি) হিসেবে বছরে ৫৮৪ কেজি দানাদার; প্রতি কেজি দানাদার ২০/- টাকা হিসেবে বছরে মোট খরচ = ১১,৬৮০.০০ টাকা।	-	১১,৬৮০.০০
ঔষধ/ভেকসিন/কৃমিনাশক*	১,০০০.০০	১,৫০০.০০
মোট ব্যয়	**২৩,১৪০.০০**	**১৩,১৮০.০০**

* উপজেলা/জেলা পশু হাসপাতালে বা উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিস থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

(খ) আয়	১ম বছর (টাকা)	২য় বছর (টাকা)
প্রথম বছরে খাসী/ছাগী বিক্রি ঃ ৬ থেকে ৮ মাস বয়সী ৮টি বাড়ন্ত ছাগল; প্রতিটি ছাগলের মূল্য ২,৫০০.০০ টাকা হিসেবে (৮×২,৫০০.০০= টাকা ২০,০০০.০০)।	২০,০০০.০০	-
দ্বিতীয় বছর ঃ খাসী/ছাগী বিক্রি : ৬ থেকে ৮ মাস বয়সী ১২টি বাড়ন্ত ছাগল; প্রতিটি ছাগলের মূল্য ২,৫০০.০০ টাকা হিসেবে (১২×২,৫০০.০০ = ৩০,০০০.০০) টাকা।	-	৩০,০০০.০০
১ম ও ২য় বছরে খামার থেকে পাওয়া ১২টি প্রজননক্ষম ছাগী (১২×২৫০০.০০) = ৩০,০০০.০০ টাকা।	৩০,০০০.০০	৩০,০০০.০০
	৬০০.০০	৬০০.০০
মোট আয়	**৫০,৬০০.০০**	**৫০,৬০০.০০**
(গ) নীট আয় (খ-ক)	**২৭,১৪০.০০**	**৩৭,৪২০.০০**

আধা নিবিড় পদ্ধতিতে ভেড়া পালন

ভেড়া বাংলাদেশের সব এলাকায় পাওয়া যায় তবে নদীর চর ও উপকূলীয় এলাকায় এর ঘনত্ব বেশি। এদেশে সাধারণত ছেড়ে বা চরিয়ে ভেড়া পালন করা হয়। এ অবস্থায় সাধারণত অপুষ্টি, কৃমি এবং অন্যান্য রোগের কারণে এভাবে পালিত ভেড়া তাদের উৎপাদনশীলতার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে না। আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ভেড়া চরানোর পাশাপাশি সম্পূরক খাদ্য প্রদান, কৃমি দমন, সংক্রামক রোগ দমন, উপযুক্ত বাসস্থান এবং পরিকল্পিত প্রজনন করানো হয়। ফলে তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং খামারী অধিক লাভবান হয়। বাড়িতে ভেড়া পালন ও চরিয়ে বেড়ানোর ন্যূনতম সুবিধা আছে এবং ভেড়া পালনে যে পরিবারের পূর্ব অভিজ্ঞতা অথবা আগ্রহ আছে, এমন গ্রামীণ মহিলা কৃষক/কৃষাণী পরিবার, বেকার যুবক/যুবতী এ প্রযুক্তির আওতায় ভুক্ত।



চিত্র ঃ ভেড়া পালন

বাসস্থান

রাতে এবং দিনের কিছু সময়ে বসবাসের জন্য (বিশেষত বৃষ্টির দিনে) ভেড়ার আবাসস্থল প্রয়োজন। ২/৩টি বাচ্চাসহ প্রতিটি বয়স্ক ভেড়ীর জন্য ৪ বর্গ মিটার জায়গা প্রয়োজন। ৪টি ভেড়ী দিয়ে শুরু করা একটি খামারে ২য় বছরে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২৩টি ভেড়া (১টি ভেড়া, ৪টি ভেড়ী, ৪টি বাড়ন্ত খাসি, ৪টি বাড়ন্ত পাঠি ও ১০টি বাচ্চা) হতে পারে। এজন্য ৪ মিটার লম্বা ও ২ মিটার চওড়া এবং ৫০ সেমি উঁচু বাঁশ/কাঠের মাঁচার প্রয়োজন হয়। মাচাটি অপসারণযোগ্য হবে। প্রতিদিন মাচা সরিয়ে নিচের ময়লা পরিস্কার করতে হবে। শীতকালে মাঁচার উপর খড় দিতে হবে। আবাসস্থলের দেয়াল বাঁশের তৈরি হলেও চলবে, তবে চাটাই বা চটের পর্দা থাকতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ভেড়ার দৈনিক ৫-৬ ঘন্টা (সকাল ৯.০০-১২.০০ এবং বিকাল ৩.০০-৬.০০) চরানো হয়। দিনের অবশিষ্ট সময় সাধারণত খামারীর বাড়িতে থাকে। বাড়িতে থাকা অবস্থায় বয়স্ক ভেড়া কাটা ঘাস/পাতা ২-৩ কেজি এবং প্রতিটি বাচ্চা/বাড়ন্ত ভেড়াকে ১-২ কেজি দিতে হবে। তাছাড়া দিনে (সকালে ও সন্ধায়) বয়স্ক (দুগ্ধবতী/গর্ভবর্তী) প্রতিটি ভেড়াকে ২৫০-৩০০ গ্রাম দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ সারণী-১ অনুযায়ী যে কোন একটি দিতে হবে।

সারনী-১ ঃ ভেড়ার জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ

মিশ্রণ-১		মিশ্রণ-২	
উপাদান	পরিমান (%)	উপাদান	পরিমান (%)
ভুট্টা ভাঙ্গা	৬০	ভুট্টা/চাল ভাঙ্গা	৬০
তুষ ছাড়ানো চালের কুড়া	১৯	তিল/সরিষা/সয়াবিন/খৈল	২০
ডালের ভূষি	২০	তুষ ছাড়ানো চালের কুড়া	১৯
লবণ	১	লবণ	১

বাচ্চা ও বাড়ন্ত ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

জন্মের সাথে সাথে মায়ের শালদুধ খাওয়াতে হবে। বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে মায়ের দুধ ও চরানোর পাশাপাশি দানাদার খাদ্য ও ঘাস সারনী-২ অনুসারে দিতে হবে।

সারনী-২ঃ বাচ্চা ও বাড়ন্ত ভেড়ার দৈনিক খাদ্য তালিকা

বাচ্চা (০-৩) মাস ভেড়া						বাড়ন্ত (৪-১২) মাস ভেড়া				
বয়স সপ্তাহ	ওজন (কেজি)	দুধ (মিলি/দিন)	দানাদার (গ্রাম/দিন)	কচি ঘাস (গ্রাম/দিন)	পানি (মিলি/দিন)	ওজন (কেজি)	দুধ (মিলি/দিন)	দানাদার (গ্রাম/দিন)	কচি ঘাস (গ্রাম/দিন)	পানি (মিলি/দিন)
০-১	১.৫-২.০	৩০০	-	-	-	৪-৫	৭-৮	২০০	০.৫০	৫০০
২-৪	২.৫-৩.০	৪৫০	সামান্য পরিমান	সামান্য পরিমান	সামান্য পরিমান	৬-৭	৯.৫-১১	২০০	১.০০	৫০০
৫-৮	৩.৫-৫.০	৫০০	৪০-৫০	৪০-৫০	১৫০	৮-৯	১২.৮-১৪.৫	২০০	১.৫০	৫০০
৯-১২	৫.৫-৬.০	৩০০	১০০-১৫০	৩০০	৩০০	১০-১১	১৬-১৮	২০০	২.০০	৫০০
বাড়ন্ত ও বয়স্ক						১২	১৯-২০	২০০	২.৫০	৫০০

সবুজ ঘাসের পাশাপাশি বাড়ন্ত ও বয়স্ক ভেড়াকে ইউরিয়া মোলাসেস/মাড় মেশানো কাটা খড় খাওয়ানো যেতে পারে। এ ধরণের খড় সারণী-৩ অনুসারে তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে খড়কে ১ সেমি করে কেটে নিতে হবে। এরপর পানিতে মোলাসেস ও ইউরিয়া গুলে খড়ের সাথে মেশাতে হবে। মোলাসেসের দাম বেশি হলে ভাতের মাড়ের সাথে ইউরিয়া সারণী-৩ অনুসারে গুলে তা খড়ের সাথে মেশাতে হবে। এ ধরণের খড় তৈরির সাথে সাথেই ভেড়াকে খাওয়ানো যায় এবং তা সর্বোচ্চ ৩ দিন মজুদ রাখা যায়। একটি অভ্যস্থ ভেড়া দৈনিক ৩৫০-৫৫০ গ্রাম ইউরিয়া-মোলাসেস/ভাতের মাড় মেশানো খড় খেতে পারে। এজন্য ভেড়াকে ধীরে ধীরে খড় খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে।

সারনী-৩ঃ ইউরিয়া মোলাসেস/ভাতের মাড় মেশানো খড় তৈরির পদ্ধতি

ইউরিয়া-মোলাসেস-খড়		ইউরিয়া-ভাতের মাড়-খড়	
উপাদান	পরিমাণ	উপাদান	পরিমাণ
শুকনো খড়	১০০০ গ্রাম	শুকনো খড়*	১০০০ গ্রাম
মোলাসেস	২০০ গ্রাম	ভাতের মাড়	৫০০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩০ গ্রাম	ইউরিয়া	৩০ গ্রাম
পানি	৫০০ মিলি	-	-

স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

ভেড়ার সংক্রামক রোগের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পিপিআর, মীপ পক্স এবং এন্টরোটক্সিমিয়া। তাছাড়া কোন কোন সময়ে ক্ষুরা রোগও হতে পারে। এসব রোগ প্রতিরোধের জন্য ভেড়ার জন্য সারণী-৪ অনুযায়ী টিকা দিতে হবে।

সারনী-৪ঃ ভেড়ার বিভিন্ন রোগের টিকা দেয়ার সময়

রোগের নাম	টিকা দেয়ার বয়স/সময়						
	৩য় দিন	১০-১৫ দিন	৩ মাস	৪ মাস	৫ মাস	৬ মাস	৯ মাস
একথাইমা	১ম ডোজ	২য় ডোজ	-	-	-	-	-
ক্ষুরা রোগ*	-	-	১ম ডোজ	বুষ্টার ডোজ	-	-	২য় ডোজ
পিপিআর	-	-	১ম ডোজ	-	-	-	-
মীপ পক্স	-	-	-	-	১ম ডোজ	-	-
এন্টারোটক্সিমিয়া	-	-	-	-	-	১ম ডোজ	-

*প্রথম ডোজ টিকা প্রয়োগের ২১-৩০ দিনের মধ্যে ২য় বার বুস্টার ডোজ এবং এর পর থেকে নিয়মিত প্রতি ছয় মাস পর পর দিতে হবে।

কৃমি ও অন্যান্য পরজীবী দমন

খামারের তিন মাসের বেশি বয়সের সকল ভেড়াকে বছরে ৪ মাস অন্তর অন্তর দীর্ঘ মেয়াদে কার্যকর কৃমিনাশক দিতে হবে। উঁকুন/আঁঠালী/মাইটস প্রতিরোধে প্রতিটি ভেড়াকে প্রতি ১৫-৩০ দিন অন্তর একদিন ০.৫% মেলাথিয়ন দ্রবণ দিয়ে গোসল করাতে হবে। ইহা ছাড়াও ভেড়াকে প্রতিদিন নিয়মিত গোসল করানো প্রয়োজন।

প্রজনন ব্যবস্থা

ভেড়ীর ওজন ১২-১৩ কেজি বা ৭-৮ মাস হলে তাকে পাল দেয়া যায়। ভেড়ীর গরম হওয়ার ১২-১৪ ঘন্টা পর পাল দিতে হবে। পাল দেয়ার ১৪২-১৫০ দিনের মধ্যে ভেড়া বাচ্চা দেয়। বাচ্চা দেয়ার ১৫-৩০ দিনের মধ্যে ভেড়ী পুনরায় গরম হয়। পাল দেয়ার জন্য নির্বাচিত ভেড়ার পাঁঠা রোগমুক্ত ও ভাল জাতের হতে হবে। আন্ত:প্রজনন এড়াতে বাবা, দাদা বা নাতীকে দিয়ে প্রজনন করানো যাবে না। সম্পর্কহীন অন্য বাড়ি পাঠা দিয়ে পাল দিতে হবে।

উল কাটা

প্রতি ৪-৬ মাস পর পর ভেড়ার উল কাটতে হয়ে। সাধারণত ফাল্গুন চৈত্র মাসে (মার্চ-এপ্রিল) এবং কার্তিক অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর) মাসে ভেড়ার উল কাটার জন্য বিশেষ ধরণের কাঁচি ব্যবহার করা হয়।

বাজারজাতকরণ

সুষ্ঠু খাদ্য, স্বাস্থ্য, প্রজনন ও আবাসন ব্যবস্থাপনায় ১২-১৩ মাস বয়সী ভেড়া বা ভেড়ীর ওজন ১৯-২০ কেজি হতে পারে। এ সময় এদেরকে বাজার জাত করতে হবে। বেশি বয়সের ভেড়া অনেক সময় চর্বী জমে মারা যেতে পারে।



চিত্র ঃ ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

সারনী-৫ঃ ভেড়া পালনে আয়-ব্যয়ের বিবরণী (পূর্ণ বয়স্ক ৪টি ভেড়ী + ১টা ভেড়ার খামারের জন্য)

(ক) ব্যয়	১ম বছর (টাকা)	২য় বছর (টাকা)
ঘর বানানো খরচ (১২ × ৬) ফুট বাঁশের মাচা সহ	৩,৫০০.০০	-
৪টি ভেড়া (প্রতি ভেড়া ২৫০০.০০ টাকা হিসেবে)	১০,০০০.০০	-
১টি প্রজননক্ষম পাঠা/ভেড়া ক্রয় প্রতিটি টাকা ২,৫০০.০০	২,৫০০.০০	-
১ম বছর ঃ প্রথম ৬ মাস ৪টি ভেড়ী ও ১টি ভেড়ার দৈনিক ০.২ কেজি হিসেবে মোট (১.০ × ১৮০.০০) = ১৮০ কেজি দানাদার; শেষ ৬ মাসে ৪টি ভেড়ী ও ১টি ভেড়া (০.২ × ৫) = ১.০ কেজি এবং বাচ্চা/বাড়ন্ত ৮টি ভেড়ার (০.১ × ৮) = ০.৮ কেজি হিসেবে মোট (১.৬ × ১৮০.০০)=২৮৮ কেজি দানাদার; সর্বমোট বছরে (১৮০+২৮৮) = ৪৬৮ কেজি দানাদার প্রতি কেজি ২০.০০ টাকা হিসেবে = ৯,৩৬০.০০ টাকা।	৯,৩৬০.০০	-
২য় বছর ঃ সারা বছর ৪টি ভেড়ী ও ১টি বাচ্চা/বাড়ন্ত ভেড়ার জন্য দৈনিক (১.০ × ০.৮=১.৮ কেজি) হিসেবে বছরে ৬৫৭ কেজি দানাদার; প্রতি কেজি দানাদার ২০.০০ টাকা হিসেবে বছরে মোট খরচ = ১৩,১৪০.০০ টাকা	-	১৩,১৪০.০০
ঔষধ/ভেকসিন/কৃমিনাশক*	১,০০০.০০	১,৫০০.০০
মোট ব্যয়	**২৬,৩৬০.০০**	**১৪,৬৪০.০০**

(খ) আয়	১ম বছর (টাকা)	২য় বছর (টাকা)
প্রথম বছর ভেড়া বিক্রি ঃ ৬ থেকে ৮ মাস বয়সী ৮টি বাড়ন্ত ভেড়া; প্রতিটির মূল্য ২,৫০০.০০ টাকা হিসেবে (৮ × ২,৫০০.০০ = ২০,০০০.০০) টাকা।	২০,০০০.০০	২০,০০০.০০
দ্বিতীয় বছর ভেড়া বিক্রি ঃ ৬ থেকে ৮ মাস বয়সী ১২টি বাড়ন্ত ভেড়া; প্রতিটির মূল্য ২,৫০০.০০ টাকা হিসেবে (১২ × ২,৫০০.০০ = ৩০,০০০.০০) টাকা।	৩০,০০০.০০	৩০,০০০.০০
গোবর	৬০০.০০	৬০০.০০
মোট আয়	**৫০,৬০০.০০**	**৫০,৬০০.০০**
(গ) নীট আয় (খ-ক)	**২৪,২৪০.০০**	**৩৫,৯৬০.০০**

আধা নিবিড় পদ্ধতিতে উন্নত জাতের হাঁস পালন

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। প্রতিটি জেলা বা এলাকায় নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর, ডোবা, হাওড়-বাওড় সমূহে বছরের অধিকাংশ সময় হাঁসের জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাবার পাওয়া যায়। ফলে ঐ সকল জলাশয়ে আধা নিবিড় পদ্ধতিতে উন্নত জাতের হাঁস পালন করা খুবই লাভজনক। অবশ্য প্রাকৃতিক খাবারের সাথে হাঁসকে সম্পূরক খাবারও দিতে হবে। বাড়িতে হাঁস পালন ও চরে বেড়ানোর ন্যূনতম সুবিধা আছে এবং হাঁস পালনে যে পরিবারের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ আছে এমন গ্রামীণ মহিলা কৃষক/কৃষাণী এ প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারেন।



চিত্র ঃ পুকুরে হাঁস

জাত নির্বাচন

বাংলাদেশে সব স্থানেই হাঁস পাওয়া যায়। তবে এসব দেশী হাঁস ডিম কম দেয়। খাকি ক্যাম্বেল বা জিডিং জাতের হাঁস বছরে গড়ে ২৫০-৩০০টি পর্যন্ত ডিম দেয়। এছাড়া বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট উদ্ভাবিত হাঁস-১ ও হাঁস-২ জাত বিদেশী হাঁসের সমকক্ষ। ১৮-২০ সপ্তাহের সুস্থ বাড়ন্ত হাঁসী সংগ্রহ করতে হবে।

বাসস্থান

হাঁসের ঘর অল্প খরচের মধ্যেই তৈরি করার সম্ভব। খোলা, উঁচু ও রৌদ্র থাকে এমন জায়গা এবং যেখানে বালু মাটি, ড্রেন কাটার সুবিধা আছে এবং ঘাস জন্মাতে পারে না এমন জায়গায় ঘর করা উত্তম। লক্ষ্য রাখতে হবে ঘর যেন নড়বড়ে না হয় এবং যাতে শিয়াল, বেজি, চিকা, ইঁদুর ইত্যাদি হাঁসের ঘরে প্রবেশ করে ক্ষতি করতে না পারে। বাঁশের তৈরি ৪ সেমি ঘন বেড়া দিয়ে ঘর তৈরি করা উত্তম। বেড়া চট বা চাঁটাই দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।

হাঁসের ঘর আয়তাকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসীর জন্য ৩ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন। অতএব, ২০টি হাঁসীর জন্য ৮ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ঘরের প্রয়োজন। তবে ঘরের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার, প্রস্থ ২ মিটার এবং দরজা দক্ষিণমুখী হওয়া উত্তম। দোচালা ঘরের চালার ছাউনি হিসেবে মাঝে পলিথিন বিশিষ্ট দুই পাল্লা বাঁশের চাঁটাই, খড়, গোলপাতা, আখের পাতা, ছন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। চালা পর্যাপ্ত ঢালু করতে বাহিরের দিকে ঘরের পার্শ্বস্থ খুটি থেকে ১ মিটার থেকে ১.৫ মিটার বর্ধিত রাখতে হবে। ঘর তৈরির সময় সর্বদাই স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য এবং টেকসই এমন উপকরণ ব্যবহার করা যায়।

পালন পদ্ধতি

ধানের খড় বা গমের খড়, ধানের তুষ, কাঠের গুড়া ইত্যাদি লিটার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। লিটার সর্বদা শুকনা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ব্যবহার করলে ৩-৪ সেমি পুরু করে ব্যবহার করতে হবে।

মূলত বাহিরে চরে বেড়ানোর মাধ্যমে খাদ্য আহরণ করা এবং একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিচরণ করা এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। বছরের যে সময়ে উন্মুক্ত জলাশয়ে চাহিদা মোতাবেক খাদ্য পাওয়া যাবে না (মার্চ, এপ্রিল ও মে) সে সময় হাঁসকে প্রয়োজন মত খাদ্য সরবরাহ করা, যেমন, পার্শ্ববর্তী হাওড়, বাওড়, খাল, বিল বা পুকুর থেকে ঝিনুক ও ছোট শামুক (গুগলি) সংগ্রহ করে খওয়ানোর ব্যবস্থা করা। সম্ভব না হলে ঐ সময়ে সারণী-১ মোতাবেক ঘরে তৈরি সুষম খাদ্য খাওয়াতে হবে।

খাদ্য ও পানি ব্যবস্থাপনা

একটি হাঁসী গড়ে প্রতিদিন ১৫০ গ্রাম খাবার খায়। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ - আশ্বিন মাসে হাঁস প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রয়োজনের প্রায় ৭০% খাবার পায়। আধা নিবিড় পদ্ধতিতে অর্ধেক খাবার সরবরাহ করা হয় এবং বাকি অর্ধেক খাবার স্থানীয় জলাশয় থেকে সংগ্রহ করে থাকে। বিশটি হাঁসের জন্য ২টি পানি ও ২টি খাদ্যের পাত্র দিতে হবে। প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বাহিরে নেয়ার পূর্বে পানি খাওয়াতে হবে এবং সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকানোর পূর্বে সম্পূরক খাদ্যের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খাওয়াতে হবে। সম্পূরক খাবার প্রতিদিন বিকালে দিতে হবে। সারণী-১ অনুসারে সম্পূরক খাবারের মিশ্রণ তৈরি করতে হবে।

সারনী - ১ ঃ হাঁসের সম্পূরক খাবার মিশ্রণে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ

খাদ্য উপাদান	খাদ্য উপকরণের পরিমাণ (কেজি)
গম ও ভুট্টা ভাঙ্গা	৪৫
চাউলের কুঁড়া	৩০
তিলের খৈল/সয়াবিন খৈল	১২
প্রোটিন কনসেনট্রেট/মাছের গুড়া	১০
ঝিনুক চূর্ণ	২.৫
লবণ	০.৫
সর্বমোট	**১০০**

বি: দ্র: প্রতি ১০০ কেজি খাবারের সাথে ২৫০ গ্রাম হারে ভিটামিন এল মিশাতে হবে।

স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

হাঁসের মারাত্মক দুটি রোগ হল ডাক প্লেগ এবং ডাক কলেরা যা টিকা দিয়ে প্রতিরোধ করা যায়। পাঁচ মাস বয়সী হাঁসের ডাক প্লেগ ও ডাক কলেরা টিকা দিতে হয়, তবে উক্ত টিকার বুষ্টার ডোজ পরবর্তীতে ২নং সারণী অনুসারে দিতে হবে।

সারনী - ২ ঃ হাঁসের টিকা দেয়ার সময় ও নিয়ম

রোগের নাম	টিকার নাম	টিকা দেয়ার বয়স (১ম মাত্রা)	টিকা দেয়ার বয়স (২য় মাত্রা)	পরবর্তী মাত্রা
ডাক প্লেগ	ডাক প্লেগ টিকা ১ সিসি রানের বা বুকের মাংস	১৮-২০ দিন	৩৩-৩৫ দিন	২য় মাত্রা প্রয়োগের পরবর্তী ৬ মাস পর পর বুকের মাংসে বিধিমত প্রয়োগ ।
ডাক কলেরা	ফাউল কলেরা টিকা ১ সিসি চামড়ার নীচে	৪৫ দিন	৬০ দিন	২য় মাত্রা প্রয়োগের পরবর্তী ৬ মাস পর পর ডানার তলদেশে পালক ও শিরাহীন স্থানে চামড়ার নীচে বিধিমতে প্রয়োগ।

কোন হাঁসকে অসুস্থ দেখলে তা দল থেকে আলাদা রাখতে হবে। প্রতি সপ্তাহে ১ দিন সামান্য পানি দিয়ে ভিজিয়ে ঘরের মেঝে বা মাঁচার উপর আধা কেজি কাপড় কাচা সোডা সমভাবে ছিটিয়ে ১৫ মিনিট পরে ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে।

দৈনন্দিন পরিচর্চা

উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় একটি হাঁসী সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় মাস বয়সেই ডিম দেয়া শুরু করে। ৮-৯ মাস বয়সে সর্বোচচ উৎপাদনে পৌঁছায় এবং তা ১.৫ বছর বয়স পর্যন্ত চলতে থাকে। ডিম দেয়া হাঁসীকে সূর্য উঠার ২ ঘন্টা পরে ঘর থেকে ছেড়ে দিতে হবে। শতকরা ৯০ ভাগ হাঁসী সাধারণত ভোর ৪ টা থেকে সকাল ৮ টার মধ্যে ডিম দেয়, তাই ঐ সময় পর্যন্ত ডিম পাড়া হাঁসীকে ঘরে আটকিয়ে রাখা সমীচিন হবে।

সারনী-৩ঃ হাঁস পালনে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী (২০টি হাঁসীর জন্য)

(ক) ব্যয়	১ম বছর (টাকা)	২য় বছর (টাকা) -
সেড নির্মাণ (১০ × ৬ =৬০ বঃফুঃ আয়তনের) ২০টি খাকি ক্যাম্বেল হাঁসীর জন্য	৪,০০০.০০	-
২০টি খাকি ক্যাম্বেল হাঁসীর (বয়স ৩ মাস, প্রতিটির ক্রয় মূল্য ১০০.০০ টাকা × ২০.০০) ক্রয়	২,০০০.০০	২,০০০.০০
সম্পূরক (সাপ্লিমেন্টারি) খাদ্য হিসেবে হাঁস প্রতি চাহিদার অর্ধেক প্রতিদিন গড়ে খাদ্য সরবরাহ ৭৫ গ্রাম (প্রতি কেজি ২৪.০০ টাকা হারে), ২০টির জন্য বছরে (৭৫ গ্রাম × ২০ হাঁস × ৩৬৫ দিন × ০.০২৪ টাকা প্রতি গ্রাম খাদ্য)	১৩,১৪০.০০	১৩,১৪০.০০
টিকা/ঔষধ বাবদ	১,৫০০.০০	১,৫০০.০০
মোট ব্যয়	**২০,৬৪০.০০**	**১৬,৬৪০.০০**

(খ) আয়	১ম বছর (টাকা)	২য় বছর (টাকা)
বছরে একটি হাঁসী থেকে ন্যূনপক্ষে ২৫০টি ডিম পেলে ২০টি থেকে মোট ৫০০০ ডিম পাওয়া যাবে। প্রতিটির বিক্রয় মূল্য ৬.০০ টাকা হলে ডিম থেকে মোট আয়	৩০,০০০.০০	৩০,০০০.০০
বছর শেষে প্রতিটি হাঁসী বিক্রয় (১ বছর পর) ১৫০.০০ × ১৮ (২টি মৃত ধরে)	২,৭০০.০০	২,৭০০.০০
মোট ব্যয়	**৩২,৭০০.০০**	**৩২,৭০০.০০**
(গ) বছর শেষে নীট মুনাফা (খ-ক)	**১২,০৬০.০০**	**১৬,০৬০.০০**



চিত্র ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশে হাঁস চাষ

আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে সোনালী জাতের মুরগী পালন

আধা নিবিড় পদ্ধতি বলতে একটি অধিক উৎপাদনশীল জাতের বয়স্ক সোনালী মুরগীকে তার প্রতিদিনের খাবারের চাহিদার অর্ধেক, তথা গড়ে ৫০ গ্রাম সুষম খাবার খাওয়ায়ে ছেড়ে দিয়ে পালন করলে খুব সহজেই সে মুরগী থেকে বছরে কমপক্ষে ১৫০-১৭০ টি ডিম পাওয়া যায়। মুরগীকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক বয়স ও সময়ে কেবল ৩/৪টি রোগ প্রতিষেধক টিকা দিয়ে মৃত্যুহার রোধ করে পালন করা সম্ভব।

বাড়িতে মুরগী পালন ও চরে বেড়ানোর ন্যূনতম সুবিধা আছে এবং যে পরিবারের মুরগী পালনের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ আছে এমন গ্রামীণ মহিলা কৃষক/কৃষাণী পরিবার উক্ত প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দারিদ্র বিমোচন তথা কর্মসংস্থান ও পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা অনায়াসে মিটাতে পারেন।



চিত্র ঃ সোনালী জাতের মোরগ ও মুরগী

জাত নির্বাচন

সোনালী একটি উন্নতমানের হাইব্রিড জাতের মুরগী। স্থানীয়ভাবে খাপ খাইয়ে চলতে অভ্যস্ত ও আধানিবিড় পদ্ধতিতে পালন উপযোগী। এই জাতের মুরগী বাণিজ্যিকভাবে পালন করা খুবই লাভজনক। ইহা দেখতেও বেশ সুন্দর এবং আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। পূর্ণ বয়স্ক একটি মুরগীর গড় দৈহিক ওজন হয় ১.৫-২.০ কেজি। বছরে ১৫০-১৭০টি ডিম দেয়।

ঘর নির্মাণ

প্রতিটি সোনালী জাতের মুরগীর বসবাসের জন্য গড়ে ১.৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়। অতএব, ২০টি মুরগীর জন্য ৫ বর্গমিটার অর্থাৎ ২ মিটার × ২.৫ মিটার ফুট আকারের ঘর হলে চলবে। ৩৫ সেমি উঁচু একটি মাঁচার উপর ঘর নির্মাণ করতে হবে। ঘর কম খরচের মধ্যেই নির্মাণ করার চেষ্টা করতে হবে। ঘরটি লম্বালম্বি পূর্ব-পশ্চিমে স্বাভাবিক ভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে সূর্যের আলো ঘরের মধ্যে সরাসরি প্রবেশ করতে না পারে এবং বায়ু এক পাশ থেকে প্রবেশ করে অন্য পাশ দিয়ে বেড়িয়ে যেতে পারে। খোলা, উঁচু ও রৌদ্রে থাকে এমন জায়গা এবং যেখানে বালু মাটি এবং ড্রেনের সুবিধা আছে এমন জায়গায় ঘর করা উত্তম। ঘরে যাতে শিয়াল, বেজি, চিকা, ইঁদুর ইত্যাদি প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে। বাঁশের তৈরি এবং ৪ সেমি ঘন বেড়া দিয়ে ঘর তৈরি করা উত্তম। বেড়া চট বা চাঁটাই দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। দোচালা ঘরের, চালার ছাউনি হিসেবে মাঝে পলিথিন বিশিষ্ট দুই পাল্লা বাঁশের চাঁটাই, খড়, গোলপাতা, আখের পাতা, ছন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। মুরগীর ঘরে যাতে বৃষ্টির পানি না ঢুকে সে জন্য চালা বাহিরের দিকে ঘরের পার্শ্বস্থ খুটি থেকে ১ থেকে ১.৫ মিটার বর্ধিত রাখতে হবে। মাচা তৈরি করা সম্ভব না হলে ঘরের মেঝে বিছানা হিসেবে ধানের খড় বা গমের খড়, ধানের তুষ, কাঠের গুড়া ইত্যাদি লিটার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। লিটার সর্বদা শুকনা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ব্যবহার করলে ৪-৫ সেমি পুরু করে ব্যবহার করতে হবে। ঘর পরিস্কার করতে ১০ লিটার পানির সাথে ৪০ মিলি ক্লোরেক্স মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

বাছাইকরণ

চার থেকে পাঁচ মাস বয়সী ২০টি স্বাস্থ্যবান সোনালী জাতের সুস্থ মুরগী স্থানীয় সরকারী মুরগীর খামার বা বেসরকারী খামার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।



চিত্র ঃ সোনালী মুরগী

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

বয়স্ক মুরগীকে বাড়ির চৌহুদ্দি থেকে তাদের খাদ্য কুড়িয়ে খাওয়ার জন্য সকাল ৯.০০টা থেকে দুপুর ১২.০০টা এবং বেলা ৩.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হবে। দুপুর ১২.০০টা থেকে বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত তাদেরকে ঘরের ভিতরে আটকে রেখে তাদের পুষ্টির চাহিদার ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে প্রতিটি মুরগীকে ৫০ গ্রাম হারে দানাদার খাবার খেতে দিতে হবে। উক্ত খাবার বাজারে প্রাপ্ত মুরগীর ফিডারের মাধ্যমে দিতে হবে। প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও বিকালে পরিস্কার সুপেয় পানি পরিস্কার পাত্রের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে।

সারনী-১ঃ বয়স্ক মুরগীর সম্পূরক খাবার মিশ্রণে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ (কেজি/১০ কেজি)

খাদ্য উপাদান	খাদ্য উপকরণের পরিমাণ (কেজি)
চাল ভাঙ্গা/ ভুট্টা ভাঙ্গা/গম ভাঙ্গা	৪.৫
চাউলের কুড়া	২.৩
শুটকি মাছের গুড়া বা প্রোটিন কনসেনট্রেট	১.৪
তিল/সোয়াবিন খৈল	১.০
ঝিনুক ভাঙ্গা/ডিসিপি	০.৫
লবণ	০.১
ভিটামিন এল	০.২

অন্যান্য করণীয়

প্যানাকোর/প্যানাক্লিয়ার/পোলনেক্স/এভেনিক্স ইত্যাদি কৃমিনাশক ৫ মিলি/মুরগী হিসেবে বছরে মোট চার বার দিতে হবে। উক্ত কৃমিনাশক যদি টেবলেট হিসেবে পাওয়া যায় তবে ১৫-২০টি মুরগীর জন্য ১টি ট্যাবলেট এবং পাউডারের ক্ষেত্রে প্রতি ৮-১০ টির জন্য ১ গ্রাম হিসাবে দিতে হবে। উক্ত ঔষধ পানি বা আটার সাথে মিশিয়ে মুরগীকে খালি পেটে দিতে হবে। প্রতিবার মুরগীর ঘরে কাজ করার আগে ও পরে হাত ভালভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং কাজের সময় মুখে এক টুকরা কাপড় বেঁধে নিতে হবে। সপ্তাহে কমপক্ষ ১ বার ঘরের ভিতর/বাহির ও চারিপাশে ব্লিচিং পাউডার/জীবানুনাশক ছিটাতে হবে। এক ঘরে এক সাথে একই বয়সের, একই জাতের ও আকারের মুরগী রাখতে হবে।

প্রতিদিন থাকার ঘর, খাদ্য ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে। মুরগী মারা গেলে অবশ্যই মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে তবে একবারে ২/৩টি বা আরো বেশি মারা গেলে একটি ঢাকনা যুক্ত পাত্রে তা সংরক্ষণ করে অবশ্যই স্থানীয় পশু সম্পদ অফিসে খবর দিতে হবে।

সারনী-২ঃ স্বাস্থ্য ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

টিকার নাম	টিকা দেয়ার সময়/বয়স
আর. ডি. ভি	খামারে তোলার ১০ দিন পর ১ম মাত্রা, পরবর্তীতে ৬ মাস পর পর।
ফাউল পক্স	খামারে তোলার ১৭ দিন পর ১ম মাত্রা, পরবর্তীতে ৬ মাস পর পর।
ফাউল কলেরা	খামারে তোলার ২৪ দিন পর ১ম মাত্রা, পরবর্তীতে ৬ মাস পর পর।

*ভ্যাকসিন কর্মসূচী পোল্ট্রি রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে করা উচিত

সারনী-৩ঃ মুরগী পালনে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী (২০ টি মুরগীর জন্য)

(ক) ব্যয়	১ম বছর (টাকা)	২য় বছর (টাকা)
সেড নির্মাণ (৩০ বঃফুঃ আয়তনের) ২০টি সোনালী জাতের মুরগীর জন্য	৪,০০০.০০	-
২০টি সোনালী জাতের পুলেট (বয়স ৪-৫ মাস, প্রতিটির ক্রয় মূল্য টাকা ১৫০.০০ × ২০) ক্রয়	৩,০০০.০০	৩,০০০.০০
টিকা/ঔষধ বাবদ ব্যয়	১,৫০০.০০	১,৫০০.০০
মুরগী প্রতি খাদ্য গড়ে ৫০ গ্রাম/দিন, (প্রতি কেজি টাকা ২৪.০০) ২০টির জন্য বছরে (৫০ গ্রাম × ২০ মুরগী × ৩৬৫ দিন × ০.০২৪ টা:, প্রতি গ্রাম খাদ্য)	৮,৭৬০.০০	৮,৭৬০.০০
মোট ব্যয়	১৭,২৬০.০০	১৩,২৬০.০০

(খ) আয়	১ম বছর (টাকা)	২য় বছর (টাকা)
বছরে মুরগী প্রতি ১৬০ টি ডিম বিক্রয় (প্রতিটি ৬.০০ টাকা × ২০টি মুরগী × ১৬০ টি ডিম)	১৯,২০০.০০	১৯,২০০.০০
ডিম দেয়া শেষে ১৮টি সোনালী মুরগী (২টি মৃত) বিক্রয় প্রতিটি ১৮০.০০ × ১৮	৩,২০০.০০	৩,২০০.০০
মোট আয়	২২,৪০০.০০	২২,৪০০.০০
(গ) বছর শেষে নীট মুনাফা (খ-ক)	৫,১৪০.০০	৯,১৪০.০০



চিত্র ঃ সোনালী মুরগীর ঘর

কবুতর পালন

বাংলাদেশের জলবায়ু এবং বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্র কবুতর পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এটি পরিবারের পুষ্টি সরবরাহ, সমৃদ্ধি, শোভাবর্ধনকারী এবং বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের সুষ্ঠু পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সঠিকভাবে প্রতিপালন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা যায়। কবুতরের মাংস একদিকে যেমন প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ করছে অন্যদিকে অভাবগ্রস্থ মহিলা ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।



চিত্র ঃ কবুতর

পালনের সুবিধা

- বিনিয়োগ কম।
- বেকার যুবক এবং দুস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের উপায়।
- শিক্ষিত লোকও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খামার করে আয় বর্ধন করতে পারে।
- সংক্ষিপ্ত প্রজননকাল।
- রোগবালাই কম।
- অল্প জায়গায় পালন করা যায়।
- অল্প খাদ্যের প্রয়োজন হয়।
- প্রতিপালন অত্যন্ত সহজ।
- পরিবেশ বান্ধব, ভারসাম্যতা বজায়কারী এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য।
- মাংস সুস্বাদু, পুষ্টিকর, সহজে পাচ্য এবং প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের উৎস।
- মল জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

বাসস্থান

কবুতরের ঘর হবে উঁচু ভূমিতে, মাটির প্রকৃতি হবে বালুময় এবং উত্তম নিস্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে। পর্যাপ্ত সূর্যালোক এবং বায়ুচলাচল আছে এরূপ স্থানে ঘর তৈরি করতে হবে। ঘর সাধারণত দক্ষিণমুখী হওয়া ভাল। একটি খামারের জন্য ৩০-৪০ জোড়া কবুতর আদর্শ। এরূপ ঘরের মাপ হবে ৩ ক্স ২.৭৫ মিটার । কবুতরের খোপ ২-৩ তলাবিশিষ্ট করা যায়। একজোড়া কবুতরের জন্য ২টি খোপ দরকার যাতে করে একটি খোপে ১টি কবুতর ডিমে তা দিলে অন্য খোপে আরেকটি কবুতর থাকতে পারে। এতে ডিমে তা দেয়া সুবিধা হয়। এরূপ খোপের আয়তন প্রতিজোড়া ছোট আকারের কবুতরের জন্য ৩০ সেমি × ৩০ সেমি × ২০ সেমি এবং বড় আকারের কবুতরের জন্য ৫০ সেমি × ৫৫ সেমি × ৩০ সেমি। মাটি থেকে ঘরের উচ্চতা ৬-৯ মিটার, তবে ৮ মিটার হওয়া ভাল এবং কাঁচার উচ্চতা ৩ মিটার হওয়া ভাল। স্বল্প খরচে সহজে তৈরি এবং স্থানান্তরের জন্য কবুতরের ঘর কাঠ দিয়ে তৈরি করা উত্তম। তবে সাধারণতঃ কাঠ, টিন, বাঁশ, খড় ইত্যাদি দিয়ে ঘর তৈরি করা যায়। ঘর তৈরির সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন শিয়াল, বেজি, ইঁদুর ও বনবিড়াল ইত্যাদি বন্য প্রাণি ঘরে ঢুকতে না পারে। খোপের ভেতর মাটির সরা বসিয়ে রাখলে কবুতর সরাতে ডিম পারে এবং বাচ্চা ফুটায়।

কবুতরের ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

- দানাদার খাদ্য সরবরাহের পাত্র।
- খনিজ মিশ্রণ সরবরাহের পাত্র।
- গোছল করার পাত্র।
- খোপ বা খাঁচা।
- কবুতর বসার জন্য স্ট্যান্ড।
- মগ, বালতি ও ঝাড়ু ইত্যাদি।
- ডিম পাড়ার বাসা।



চিত্র ঃ কবুতরের ঘর

খাদ্য ব্যবস্থাপনা (বাচ্চার খাদ্য)

ডিম ফোটে বাচ্চা বের হওয়ার কমপক্ষে ৪-৫ দিন পর কবুতরের বাচ্চার চোখ ফুটে। এজন্য বাচ্চাগুলো কোন দানাদার খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। এ সময় স্ত্রী এবং পুরুষ কবুতর তাদের পাকস্থলী (ক্রপ) থেকে ঘন ক্রিম বা দধির মত নিঃসরণ করে যাকে কবুতরের দুধ বলে। এ দুধ অধিক আমিষ, চর্বি এবং খনিজ লবণ সমৃদ্ধ যা খেয়ে কবুতরের বাচ্চা বড় হয় এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত খেতে পারে। বাচ্চাগুলো যখন বড় হতে থাকে তখন স্ত্রী এবং পুরুষ কবুতর উভয়ে দানাদার খাদ্যের সাথে দুধ মিশিয়ে ঠোঁট দিয়ে বাচ্চাদের খাওয়ায়। বাচ্চা বড় হয়ে নিজে খাদ্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত এভাবে খাবার খাওয়াতে থাকে।

কবুতর দানাদার জাতীয় খাদ্য বেশি পছন্দ করে। ছোট আকারের কবুতরের জন্য ২০-৩০ গ্রাম, মাঝারি আকারের জন্য ৩৫-৫০ গ্রাম এবং বড় আকারের জন্য ৫০-৬০ গ্রাম খাদ্য প্রতিদিন দিতে হবে। দানাদার জাতীয় খাদ্যের মধ্যে গম, ধান, ভুট্টা, সরগম, ওট শতকরা ৬০ ভাগ এবং বা ডাল জাতীয় খাদ্যের মধ্যে সরিষা, খেসারি, মাশকলাই শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ সরবরাহ করতে হবে। কবুতরের ভিটামিন সরবরাহের জন্য বাজারে প্রাপ্ত ভিটামিন ছাড়া সবুজ শাকসবজি, কচি ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন।

পানি সরবরাহ

প্রতিদিন পানির পাত্র ভালভাবে পরিস্কার করে কবুতরকে দিনে ৩ বার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা উচিত। কবুতর যেহেতু ঠোঁট প্রবেশ করিয়ে ঢোক গেলার মাধ্যমে পানি পান করে সেহেতু পানির পাত্র গভীর জাতীয় হওয়া উচিত। দুই সপ্তাহ পর পর পটাশ মিশ্রিত পানি সরবরাহ করলে পাকস্থলী বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। খামার হতে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য স্বাস্থ্য সম্মত খামার ব্যবস্থাপনা বা খামারের জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেড এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন পর্যাপ্ত আলো প্রবেশ এবং বায়ু চলাচল করতে পারে।

কবুতর উঠানোর আগে খামারসহ ব্যবহার্য সকল যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে পানি দিয়ে পরিস্কার করার পর পানির সাথে কার্যকরি জীবাণুনাশক (যেমন ০.২-০.৫% সোডিয়াম হাইপোকোরাইড বা আয়োডিন দ্রবণ (কোম্পানি নির্দেশ মোতাবেক) মিশিয়ে খামারের সকল অংশে স্প্রে করতে হবে। সুস্থ সবল কবুতর সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনে বাহ্যিক পরজীবী নিধনের জন্য ০.৫% ম্যালাথিয়ন দ্রবণে কবুতরকে গোসল করিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কবুতরের মুখ এ দ্রবণে ডুবানো যাবে না। হাত দিয়ে মাথায় লাগিয়ে দিতে হবে। অন্ততঃ পরজীবী প্রতিরোধের জন্য কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করাতে হবে। খামারে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

টিকা প্রদান

খামারে রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কবুতরের প্রজননকালীন প্যারেন্ট কবুতরগুলোকে রাণিক্ষেত রোগের ইনএকটিভেটেড মৃত টিকা প্রয়োগ করা উত্তম। টিকা প্রয়োগের কমপক্ষে ৩ সপ্তাহ পর বাচ্চা ফুটানোর জন্য ডিম সংগ্রহ করতে হবে। তবে বাচ্চা কবুতর উড়তে শেখার সাথে সাথেও টিকা প্রয়োগ করা যায়। জীবিত বা ইনএকটিভেটেড মৃত উভয় টিকাই প্রয়োগ করা যায়। জীবিত টিকা চোখে এবং মৃত টিকা চামড়ার নিচে বা মাংসপেশিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম টিকা (জীবিত) প্রয়োগের কমপক্ষে ১৪ দিন পর দ্বিতীয় বা বুস্টার ডোজ দিতে হবে। বছরে ২ বার রানীক্ষেতের টিকা প্রদান করতে হবে। দেশীয় জাতের কবুতর পালনের আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণী-১ এ দেয়া হলো ঃ

সারনী-১ ঃ দেশিয় জাতের কবুতর পালনে আয়-ব্যয়ের বিবরণী

(ক) ব্যয়	টাকা
৩০ জোড়া কবুতরের দাম (প্রতি জোড়া ১৫০.০০ টাকা হিসেবে)	৪,৫০০.০০
ঘর এবং যন্ত্রপাতি বাবদ	২,০০০.০০
খামার পরিচালনা খরচ	১,০০০.০০
মোট ব্যয়	৭,৫০০.০০

(খ) আয়	টাকা
১ জোড়া কবুতর প্রতি বছর গড়ে বাচ্চা দেয় ৬ জোড়া সুতরাং ৩০ জোড়া কবুতর প্রতি বছর গড়ে বাচ্চা দেয় (৬ × ৩০) = ১৮০টি (প্রতি জোড়া বাচ্চার দাম গড়ে ১০০.০০ টাকা) × ১৮০ টাকা	১৮,০০০.০০
বিষ্ঠার বিক্রয় মূল্য (প্রতি বছর) টাকা	১,০০০.০০
মোট আয়	১৯,০০০.০০
(গ) নীট মুনাফা (খ-ক)	১১,৫০০.০০

বাংলাদেশে কবুতরকে সাধারণত শখের বা পোষা প্রাণী হিসাবে পালন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে কবুতর পালন করা হচ্ছে। কবুতরের মাংশ অত্যন্ত সুস্বাদু। গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে কবুতর পালনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক আয়ের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কবুতরের মাংস একদিকে যেমন প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ করেছে, অন্যদিকে তেমনি অভাবগ্রস্থ মহিলা ও বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের একটি ক্ষেত্র।

বার মাসে তের জোড়া
কবুতরে ঘর ভরা

কোয়েল পালন

কোয়েল ছোট আকারের গৃহপালিত পাখি। পোল্ট্রির অনেক প্রজাতির মধ্যে কোয়েল একটি। বাড়ির আঙ্গিনায় ঘরের কোণে ২-১০ টা কোয়েল সহজেই পালন করা যায়। কোয়েল পাখি প্রতিপালন করে পারিবারিক পুষ্টি যোগানের সাথে সাথে অতিরিক্ত কিছু আয় করা সম্ভব। স্বল্প মূল্যে অল্প জায়গায় অল্প খাদ্যে কোয়েল পালন করা যায়।



চিত্র ঃ কোয়েল

পালনের সুবিধা

- কোয়েল দ্রুত বর্ধনশীল।
- অল্প বয়সে যৌন পরিপক্কতা লাভ করে (মাত্র ৬-৭ সপ্তাহে ডিম পাড়া শুরু করে)।
- সঠিক যত্ন এবং ব্যবস্থাপনায় বছরে ২৫০-২৬০ টি ডিম পাড়ে।
- ডিমে কোলেস্টেরলর কম।
- ডিমে প্রোটিনের ভাগ বেশি।
- অন্যান্য পোল্ট্রির দৈহিক ওজনের তুলনায় কোয়েলের ডিমের শতকরা ওজন বেশি।
- ৮-১০ টা কোয়েল একটি মুরগির জায়গায় পালন করা যায়।
- মাত্র ১৭-১৮ দিনে কোয়েলের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া কোয়েল পালনের উপযোগী।
- রোগ বালাই খুব কম।
- খাবার খুবই কম লাগে।
- অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে অল্প দিনে বেশি লাভ করা যায়।

উৎপাদন

কোয়েলের ডিম ৮-১০ সপ্তাহ বয়সে সকল ঋতুতেই পুনরুৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায়। শুধুমাত্র ডিম ফুটাতে চাইলে স্ত্রী এবং পুরুষ কোয়েল একত্রে রাখার প্রয়োজন হয়। ডিমের জন্য স্ত্রী কোয়েল পালন অধিক লাভজনক। আশানুরূপ ডিমের উর্বরতা পেতে হলে ২ঃ১, ৫ঃ২ বা ৩ঃ১ অনুপাতে স্ত্রী এবং পুরুষ কোয়েল একত্রে রাখতে হবে। স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের আবহাওয়ায় কোয়েল ৬-৭ সপ্তাহ বয়সে ডিম দেয়া শুরু করে। ৮-১০ সপ্তাহ বয়সে ৫০% ডিম পাড়ে এবং ১২ সপ্তাহের পর থেকে ৮০% ডিম পাড়ে। উপযুক্ত পরিবেশে প্রথম বছর গড়ে ২৫০-৩০০ টি ডিম পাড়ে।

ডিমের রঙ, আকার ও আকৃতি

শুধুমাত্র কিছু জাতের কোয়েল সাদা রঙের ডিম পাড়ে। তাছাড়া বেশিরভাগ কোয়েলের ডিম বাদামী এবং গায়ে ফোঁটা ফোঁটা দাগ আছে। কোয়েলের ডিমের গড় ওজন ১০-১২ গ্রাম।

বাসস্থান

কোয়েল পালনের জন্য লিটার পদ্ধতির চেয়ে কেইজ পদ্ধতি অধিক লাভজনক। ছোট জোড়া খাঁচা বা কেইজ কোয়েল পালনের জন্য অধিকতর উপযোগী। বাচ্চা অবস্থায় প্রতিটি কোয়েলের জন্য ৭৫ বর্গ সেমি এবং ১০০ বর্গ সেমি জায়গায় যথাক্রমে খাঁচায় ও মেঝেতে ২৫০ বর্গ সেমি জায়গা প্রয়োজন। দুইটি ডিম পাড়া কোয়েলের জন্য একটি ১২ সেমি × ২০ সেমি মাপের ঘর যথেষ্ট। কোয়েলের ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

খাচায় কোয়েল পালন

খাচায় ৫০টি বয়স্ক কোয়েলের জন্য ১২০ সেমি দৈর্ঘ্য, ৬০ সেমি প্রস্থ এবং ৩০ সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট একটি খাঁচার প্রয়োজন। খাঁচার মেঝের জালিটি হবে ১৬-১৮ গেজি; ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত বাচ্চার খাঁচার মেঝের জালের ফাঁক হবে ৩ মিমি × ৫ মিমি।

খাবার পাত্র

স্বাভাবিকভাবে প্রতি ২৮টি বাচ্চার জন্য একটি খাবার পাত্র (যার দৈর্ঘ্য ৫০ সেমি, প্রস্থ ৮ সেমি এবং উচ্চতা ৩ সেমি) এবং প্রতি ৩৪টি বয়স্ক কোয়েলের জন্য একটি খাবার পাত্র (যার দৈর্ঘ্য ৫৭ সেমি ও প্রস্থ ১০ সেমি এবং উচ্চতা ৪ সেমি) ব্যবহার করা যায়। সর্বদাই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পানি সরবরাহ করতে হবে। প্রতিটি বয়স্ক কোয়েলের জন্য ০.৬ সেমি পানির পাত্রের জায়গা দিতে হবে।

লিটার এবং এর ব্যবস্থাপনা

তুষ, বালি, ছাই, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি দ্রব্যাদি লিটার হিসেবে কোয়েলের ঘরের মেঝেতে ব্যবহার করা যায়। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তুষ উপযোগী এবং সহজলভ্য। লিটারের শতকরা ১-২ ভাগ চুন মিশিয়ে দিতে হবে যেন লিটার শুস্ক এবং জীবাণুমুক্ত হয়।


চিত্র ঃ খাঁচায় কোয়েল পালন

আলোক ব্যবস্থাপনা

কাঙ্খিত ডিম উৎপাদন এবং ডিমের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য দৈনিক ১৪-১৮ ঘন্টা আলো প্রদান করা প্রয়োজন।

সুষম খাদ্য

কোয়েলের খাবারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-স্টার্টার (০-৩ সপ্তাহ), বাড়ন্ত (৪-৫ সপ্তাহ) এবং লেয়ার বা ব্রিডার (৬ সপ্তাহ) তিন সপ্তাহ পর্যন্ত।

বয়স	খাদ্যের প্রকার (ম্যাশ)	প্রোটিন (%)	বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালরী/কেজি)
০-৩ সপ্তাহ	স্টার্টার	২৭	২৮০০
৪-৫ সপ্তাহ	বাড়ন্ত	২৩	২৭০০
৬ সপ্তাহ থেকে	লেয়ার এবং ব্রিডার	২২-২৪	২৫০০-২৭০০

উপসংহার

উৎপাদনের দিক থেকে কোয়েল অধিক উৎপাদনশীল। অন্যান্য পোল্ট্রির তুলনায় কোয়েলের মাংস এবং ডিম গুণগতভাবে শ্রেষ্ঠ। কোয়েলের ডিমে কোলেস্টরেল কম এবং আমিষ বেশি। একটি মুরগির পরিবর্তে ৮টি কোয়েল পালন করা যায়। অল্প জায়গায় বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় অল্প খরচে পারিবারিক পর্যায়ে অথবা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোয়েল পালন দেশে পুষ্টি ঘাটতি মেটাতে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। কোয়েল পালনে আয়-ব্যয়ের বিবরণী সারণী-১ দেয়া হলো।

সারনী-১ ঃ কোয়েল পালনে আয়-ব্যয়ের বিবরণী

(ক) ব্যয়	টাকা
১০০টি কোয়েলের দাম (১০০ × ৩০.০০ টাকা প্রতিটি)	৩,০০০.০০
ঘর এবং যন্ত্রপাতি বাবদ	৫,০০০.০০
খাবার খরচ	৫,০০০.০০
মোট ব্যয়	**১৩,০০০.০০**

(খ) আয়	টাকা
১টি কোয়েল গড়ে বছরে ২৫০ টি ডিম দেয় (২৫০ × ৬০টি স্ত্রী কোয়েল) = ১৫০০০ টি ডিম প্রতিটি ডিম ২.০০ টাকা হিসেবে মোট মূল্য (১৫০০০.০০ × ২.০০ টাকা)	৩০,০০০.০০
মোট আয়	**৩০,০০০.০০**
(গ) মুনাফা (খ-ক)	**১৭,০০০.০০**

মৎস্য উপখাত
গিফট তিলাপিয়া চাষ

থাইল্যান্ড থেকে আনা উচ্চ ফলনশীল গিফট তিলাপিয়ার ওপর গবেষণা চালিয়ে আরও উন্নত মানের একক-লিঙ্গের (পুরুষ) গিফট তিলাপিয়া উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। জনপ্রিয় এ মাছের উৎপাদন এখন আগের চেয়ে ২০-৩০% বেশি করা সম্ভব। ফলে চাষীর মুনাফাও আনুপাতিক হারে বেড়ে যাবে। এর চাষ প্রযুক্তি সহজ ও তুলনামূলকভাবে কম খরচেই উন্নত জাতের গিফট তিলাপিয়ার চাষ করা যায়। চার মাস বয়সী মাছ বাজারজাতকরণ করা যায়। বাজারে চাহিদা প্রচুর। চাষযোগ্য পুকুর, চাষে আগ্রহ ও কিছু অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।



চিত্র ঃ গিফট তিলাপিয়া

পুকুর নির্বাচন

মাছ চাষাপোযোগী যে কোন পুকুরই হতে পারে, তবে তিলাপিয়া দ্রুত বর্ধনশীল বিধায় অপেক্ষাকৃত ছোট পুকুর এমনকি মৌসুমী পুকুরেও এর সফল চাষ সম্ভব।

পুকুর প্রস্তুতি

- পাড় ও তলদেশ-প্রয়োজনে পানি নিস্কাশন করে পুকুরের পাড় মেরামত ও তলদেশ অতিরিক্ত কাদামুক্ত করে সমান করতে হবে। এ কাজটি জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যেই করা উত্তম।
- জলজ আগাছা ও আমাছাসহ রাক্ষুসে মাছ দূরীকরণ-কায়িক শ্রমের মাধ্যমে জলজ-আগাছা দুর করতে হবে এবং বারবার জাল টেনে পুকুর থেকে সকল অনাঙ্খিত মাছ ধরে ফেলতে হবে।
- চুন প্রয়োগ-প্রতি শতাংশে এক কেজি (৩০ শতক পুকুরের জন্য চুন লাগবে ৩০ কেজি)।
- সার প্রয়োগ-চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর প্রতি শতকে ৪ কেজি গোবর প্রয়োগ করতে হবে।

পোনা মজুদ

পোনা পুকুরে ছাড়ার সময় নতুন পানির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পোনা বহনকারী পাত্রের পানি পুকুরের পানির সাথে কিছুটা সময় নিয়ে অল্প অল্প করে পরিবর্তন করতে হবে যেন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পিএইচ (অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব) ক্রমশ পুকুরের পানির মত হয়ে যায়। মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত মজুদের উত্তম সময় হলেও সম্পদ ও সময়ের সঠিক ব্যবহারের জন্য মে মাসের মধ্যেই পোনা মজুদ করা শ্রেয়।

মজুদ হার

আকারের ওপর নির্ভর করে প্রতিটি ৬-৮ গ্রামের পোনা শতকে ২৫০-৩০০ টি মজুদ করতে হবে। আকার ছোট হলে সংখ্যা বাড়বে। গড়ে ৭ গ্রামের পোনা শতকে গড়ে ২৭৫টি হিসেবে ৩০ শতক পুকুরে মজুদকৃত মাছের সংখ্যা ৮,২৫০ এবং মোট ওজন ৫৮ কেজি।

পোনার উৎস

যে সব হ্যাচারীতে উৎপাদিত তিলাপিয়ার পুরুষ-সংখ্যা শতকরা ৯৮ বা তার চেয়েও বেশি কেবল সেখান থেকেই পোনা সংগ্রহ করতে হবে। অন্যথায় উৎপাদন ব্যহত হয়ে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা এ ব্যাপারে কার্যকর পরামর্শ দিতে সক্ষম।

নিয়মিত সার প্রয়োগ

গোবর সার প্রতি ১৫ দিনে শতকপ্রতি ৪ কেজি করে প্রয়োগ করতে হবে (৩০ শতক পুকুরে প্রতি ১৫ দিনের জন্য প্রয়োজন ১২০ কেজি এবং চাষ মৌসুমের জন্য প্রয়োজন ১২০ × ৯ = ১০৮০ কেজি গোবর)।

খাবার ব্যবস্থাপনা

প্রায় ২৫% আমিষ সম্বলিত তৈরি খাবার (বাজারে কিনতে পাওয়া যায়) অথবা ১০% মৎস্য চূর্ণ, ৫০% চালের কুড়া এবং ৪০% গমের ভূষি মিশিয়ে পোনা মজুদের ১ দিন পর হতে ১৫ দিন অন্তর অন্তর মোট দৈহিক গড় ওজনের উপর ভিত্তি করে খাবারের পরিমাণ নির্ণয় করে তা দিনে দুইবার সমভাগ করে পুকুরে দিতে হবে। পুকুরে খাবার দেয়ার নিয়মাবলী (৩০ শতক আকারের পুকুর) সারণী-১ এ দেয়া হলো। মান সম্পন্ন খাদ্যের উৎসের ব্যাপারে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

সারনী-১ঃ ৩০ শতাংশ পুকুরে দৈনিক খাদ্য প্রয়োগ তালিকা

মাস (মাছ ছাড়ার পর)	পুকুরে মাছের বয়স ও খাবার দেয়ার সময়কাল	মাছের প্রাক্কলিত ওজন (কেজি)	প্রাক্কলিত দেয় দৈনিক খাবারের পরিমাণ পক্ষের শুরুতে ওজনের ভিত্তিতে	প্রতি ১৫ দিনের খাবারের পরিমাণ (কেজি)
১ম	০১-১৫ দিন	৫৮-৯০	৪.৬৪ কেজি (ওজনের ৮% হারে)	৬৯.৬০
	১৬-৩০ দিন	৯০-১৪০	৫.৮০ কেজি (পূর্বের সাথে ২৫% যোগ করে)	৮৭.০০
২য়	৩১-৪৫ দিন	১৪০-২১০	৯.৮০ কেজি (ওজনের ৭% হারে)	১৪৭.০০
	৪৬-৬০ দিন	২১০-২৯০	১২.২৫ কেজি (পূর্বের সাথে ২৫% যোগ করে)	১৮৩.৭৫
৩য়	৬১-৭৫ দিন	২৯০-৩৮০	১৭.৪০ কেজি (ওজনের ৬% হারে)	২৬১.০০
	৭৬-৯০ দিন	৩৮০-৫০৫	২১.৭৫ কেজি (পূর্বের সাথে ২৫% যোগ করে)	৩২৬.২৫
৪র্থ	৯১-১০৫ দিন	৫০৫-৬৮০	২৫.২৫ কেজি (ওজনের ৫% হারে)	৩৭৮.৭৫
	১০৬-১২০ দিন	৬৮০-৮৭৫	৩০.৩০ কেজি (পূর্বের সাথে ২০% যোগ করে)	৪৫৪.৫০
৫ম	১২১-১৩৫ দিন	৮৭৫-১১২৫	৩৫.০০ কেজি (ওজনের ৪% হারে)	৫২৫.০০
	১৩৬-১৫০ দিন	১১২৫-১৪৫৭	৪২.০০ কেজি (পূর্বের সাথে ২০% যোগ করে)	৬৩০.০০
	৫ মাস শেষে	মোট ওজন ১৪৫৭ কেজি	**মোট খাবারের পরিমাণ**	**৩০৬৩.০০**

মাছ ধরা ও বিক্রয়

- পাঁচ (৫) মাসের মধ্যে মাছ বিক্রয় উপযোগী হবে (প্রতিটি মাছের গড় ওজন ১৭৫ গ্রাম)। সকল মাছ ধরে ফেলার পর চাষী ইচ্ছে করলে একই পুকুরে পুনরায় পোনা মজুদ করে একই পদ্ধতিতে খাবার দিয়ে চাষ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে পারে। এতে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে
- সকালে মাছ ধরা উত্তম
- মাছ ধরার জন্য ঝাঁকি জাল বা বেড় জাল ব্যবহার করা যায়।

সারনী-২ঃ গিফট তিলাপিয়ার আয়-ব্যয়ের বিবরণী (৩০ শতক পুকুর, ৫ মাসে)

(ক) ব্যয়	টাকা
পুকুর প্রস্তুতি (পাড় মেরামত, অতিরিক্ত কাদা সরানো, আগাছা ও আমাছা মুক্ত করা)	১,০০০.০০
চুন ক্রয়ঃ ৩০ কেজি × ১৫.০০ টাঃ/কেজি	৪৫০.০০
সার ক্রয়ঃ গোবর ১২০০ কেজি × ১ টাঃ/কেজি (রাসায়নিক সার প্রয়োজন নেই)	১,২০০.০০
পোনা ক্রয় ঃ ৮২৫০টি (প্রতিটি পোনা ০.৮০ টাকা হিসেবে)	৬,৬০০.০০
খাবার ক্রয় ঃ ৩০৬৩ কেজি × ১৬.৫৩ টাকা/কেজি	৫০,৬৩৬.০০
অন্যান্য (জাল টানা, ঔষধ পত্র, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি)	৫,০০০.০০
মোট ব্যয়	**৬৪.৮৮৬.০০**

(খ) আয়	টাকা
মাছ বিক্রি (১৪৫৭ কেজি × ৭০.০০ টাকা হিসেবে)	১,০১,৯৯০.০০
মোট আয়	**১,০১,৯৯০.০০**
(গ) নীট মুনাফা (খ-ক)	**৩৭,১০৪.০০**

পুকুরে থাই কই এর একক চাষ

বাংলাদেশে স্মরণাতীত কাল থেকে কই মাছ অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিশেষ করে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাড়তি অঙ্গ থাকার কারণে এ মাছ তাজা অবস্থায় বিক্রয় করা সম্ভব এবং সাধারণ মানুষ টাটকা মাছের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় না। এই কই মাছের আর একটি জাত অতি সম্প্রতি থাইল্যান্ড থেকে এনে বাংলাদেশে এর বাণিজ্যিক প্রজনন ও চাষ অত্যন্ত ফলপ্রসু ভাবে সম্ভব হয়েছে। এটি দ্রুত বাড়ে এবং ভোক্তা জনসাধারণের নিকট বিপুল গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। থাই কই চাষের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে অধিক মুনাফার সম্ভাবনা অনেক বেশি। চাষযোগ্য পুকুর ও মাছ চাষে আগ্রহ যে কোন চাষী এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন।



চিত্র ঃ থাই কই এর চাষ

পুকুর নির্বাচন

- তিন থেকে পাঁচ ফুট পানির গভীরতাসহ যে কোন স্বাদুপানি পুকুরে এর চাষ সম্ভব।
- যে কোন আয়তনের পুকুরে চাষ করা যায়।
- সহজে পুকুর শুকানোর সুবিধা থাকলে উত্তম।

পুকুর প্রস্তুতি

- **পাড় ও তলদেশ ঃ** প্রয়োজনে পানি নিস্কাশন করে পুকুরের পাড় মেরামত ও তলদেশ অতিরিক্ত কর্দম মুক্ত করে সমান করতে হবে। এ কাজটি জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যেই করা উত্তম।
- **জলজ আগাছা ও আমাছাসহ রাক্ষুসে মাছ দূরীকরণ ঃ** পানি প্রাপ্তি যদি সমস্যা না হয় সে ক্ষেত্রে পুকুরের পানি নিস্কাশন করে সব জলজ আগাছা এবং আমাছাসহ রাক্ষুসে মাছ দূর করে নিতে হবে। অন্যথায় পুকুরে বারবার জাল টেনে যতদুর সম্ভব সকল মাছ ধরে ফেলতে হবে। এরপর অবশিষ্ট সব মাছ ধরার জন্য প্রতি শতক আয়তন এবং প্রতি ফুট পানির গভীরতার জন্য ২৫-৩০ গ্রাম হারে রোটেনন প্রয়োগ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ৪ ফুট পানির গভীরতার ৩০ শতকের পুকুরে ৩.০-৩.৬ কেজি রোটেনন লাগবে। বাজারে সাধারণত ২ শক্তির রোটেনন পাওয়া যায় ৯.১% ও ৭%। শক্তি বেশি হলে ব্যবহারের পরিমাণ কম হবে অর্থাৎ ৩.০ কেজিই যথেষ্ট।
- **সার প্রয়োগ ঃ** চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর প্রতি শতকে গোবর ১০ কেজি, ইউরিয়া ১০০ গ্রাম ও টিএসপি ১০০ গ্রাম দিতে হবে। সে হারে ৩০ শতাংশ পুকুরের জন্য লাগবে ৩০০ কেজি গোবর, ৩ কেজি ইউরিয়া এবং ৩ কেজি টিএসপি
- **বেড়া স্থাপন ঃ** পুকুরের চতুর্ধারে পাড়ের উপরিতলে ১ মিটার উঁচু বেড়া স্থাপন করতে হবে যেন কই মাছ বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে। পোনা মজুদের ১৫ দিনের মধ্যে বেড়া স্থাপন করতে হবে।

পোনা মজুদ

পুকুর প্রস্তুতির ৪/৫ দিন পর যখন পানির রঙ হালকা সবুজ ধারণ করবে তখন পোনা মজুদ করা যাবে। পোনা পুকুরে ছাড়ার সময় পানির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পোনা বহনকারী পাত্রের পানি পুকুরের পানির সাথে কিছুটা সময় নিয়ে অল্প অল্প করে পরিবর্তন করতে হবে যেন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পিএইচ ক্রমশ পুকুরের পানির মত হয়ে যায়। পোনা মজুদ এপ্রিল-মে মাসে করাই উত্তম।

মজুদ হার

প্রতিটি ২-৩ গ্রাম ওজনের (আকার প্রায় ৪-৫ সেমি) ২৫০-৩০০টি পোনা প্রতি শতাংশে মজুদ করতে হবে। সে হারে ৩০ শতক পুকুরে মজুদকৃত মাছের গড় সংখ্যা ৮,২৫০টি এবং ওজন প্রায় ২১ কেজি (গড়ে প্রতিটি পোনা ২.৫ গ্রাম হিসেবে)।

খাবার ব্যবস্থাপনা

বাজারের খাবারের পরিবর্তে চাষী নিজেই নিম্নোক্ত মিশ্রণ তৈরি করে তা পুকুরে প্রয়োগ করতে পারেন। প্রতি ১০০ কেজি খাবারে মিশ্রণ তৈরির জন্য ৫০ কেজি মৎস্যচূর্ণ + ১০ কেজি সয়াবিন চূর্ণ (মিল) + ১০ কেজি গমের ভূষি + ২০ কেজি চালের কুড়া (অটোমিল) + ১০ কেজি সরিষার খৈল ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। পুকুরে পোনা মজুদের ২/১ দিন পর হতে ১৫ দিন অন্তর অন্তর মোট দৈহিক ওজনের উপর ভিত্তি করে সে খাবার দিনে দুইবারে সমভাগ করে পুকুরে দিতে হবে। পুকুরে খাবার দেয়ার নিয়মাবলী (৩০ শতক আকারের পুকুর) সারণী-১ এ দেয়া হলো।

সারনী-১ঃ প্রাক্কলিত বৃদ্ধির হার, মোট ওজন ও দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (পোনা ছাড়ার দিন মাছের সংখ্যা ৮২৫০ এবং মোট ওজন ২১ কেজি প্রতিটি পোনা মাছের গড় ওজন ২.৫ গ্রাম হিসেবে)

মাস (মাছ ছাড়ার পর)	পুকুরে মাছের বয়স ও খাবার দেয়ার সময়কাল	মাছের প্রাক্কলিত ওজন (কেজি)	প্রাক্কলিত দেয় দৈনিক খাবারের পরিমাণ পক্ষের শুরুতে ওজনের ভিত্তিতে	প্রতি ১৫ দিনের খাবারের পরিমাণ (কেজি)
১ম	০১-১৫ দিন	২১.০-৩০.৫	১.৬৮ কেজি (ওজনের ৮% হারে)	২৫.২০
	১৬-৩০ দিন	৩০.৫-৫৩.৪	২.১০ কেজি (পূর্বের সাথে ২৫% যোগ করে)	৩১.৫০
২য়	৩১-৪৫ দিন	৫৩.৪-৯০.৮	৩.৭৪ কেজি (ওজনের ৭% হারে)	৫৬.১০
	৪৬-৬০ দিন	৯০.৮-১৪৫.৩	৪.৬৮ কেজি (পূর্বের সাথে ২৫% যোগ করে)	৭০.২০
৩য়	৬১-৭৫ দিন	১৪৫.৩-২১৮.০	৮.৭২ কেজি (ওজনের ৬% হারে)	১৩০.৮০
	৭৬-৯০ দিন	২১৮.০-৩১৬.১	১০.৯০ কেজি (পূর্বের সাথে ২৫% যোগ করে)	১৬৩.৫০
৪র্থ	৯১-১০৫ দিন	৩১৬.১-৪৪২.৫	১৫.৮১ কেজি (ওজনের ৫% হারে)	২৩৭.২০
	১০৬-১২০ দিন	৪৪২.৫-৬০০.০	১৮.৯৭ কেজি (পূর্বের সাথে ২০% যোগ করে)	২৮৪.৬০
	৪র্থ মাস শেষে	মোট ওজন ৬০০ কেজি	**মোট খাবারের পরিমাণ**	**৯৯৯.১০**

মাছ ধরা ও বিক্রয়

- চার মাসে থাই কই ৭০-৮০ গ্রামের মত বড় হয়ে বিক্রয় উপযোগী হয়ে ওঠে। সকল মাছ ধরে ফেলার পর একই পুকুরে চাষী ইচ্ছে করলে পুনরায় পোনা মজুদ করে একই নিয়মে খাবার দিয়ে চাষ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে পারেন। এতে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে।
- মাছ ধরার জন্য ঝাঁকি জাল বা বেড়জাল ব্যবহৃত হতে পারে। প্রয়োজনে পুকুর শুকিয়ে সকল মাছ ধরা যেতে পারে।
- সকালে মাছ ধরা উত্তম।



চিত্র ঃ থাই কই মাছ চাষ

সারনী-২ঃ থাই কই মাছের আয়-ব্যয়ের বিবরণী (৩০ শতক পুকুর, ৫ মাসে)

(ক) ব্যয়	টাকা
পুকুর প্রস্তুতি (পাড় মেরামত, অতিরিক্ত কাদা সরানো, আগাছা ও আমাছা মুক্ত করা, রোটেনন প্রয়োগসহ)	১,০০০.০০
চুন ক্রয়-৩০ কেজি × ১৫.০০ টাকা/কেজি	৪৫০.০০
সার ক্রয় গোবর ৩০০ কেজি × ১.০০ টাকা/কেজি ইউরিয়া ৩ কেজি × ১২.০০ টাকা/কেজি টিএসপি ৩ কেজি × ৪০.০০ টাকা/কেজি	৩০০.০০ ৩৬.০০ ১২০.০০
পোনা ক্রয় ঃ ৮২৫০ টি × ০.৫০ টা/পোনা	৪,১২৫.০০
খাবার ক্রয় ঃ ১০০০ কেজি × ২৮.০০ টাকা/কেজি	২৮,০০০.০০
অন্যান্য (জাল টানা, ঔষধ পত্র, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি)	৫,০০০.০০
মোট ব্যয়	**৩৯,০৩১.০০**

(খ) আয়	টাকা
মাছ বিক্রি (৬০০ কেজি × ১৫০.০০ টাকা/কেজি)	৯০,০০০.০০
মোট আয়	**৯০,০০০.০০**
(গ) নীট মুনাফা (খ-ক)	**৫০,৯৬৯.০০**

শিং মাছের একক চাষ

শিং বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মাছ। যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পোনা উৎপাদনে সক্ষম না হওয়ায় এটি এতদিন চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি সফলতার সঙ্গে শিং মাছের পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি সফলভাবে উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবে পোনা এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে উৎপাদিত পোনার ভিত্তিতে এর বাণিজ্যিক চাষ করা সম্ভব যা বেশ লাভজনক। চাষযোগ্য পুকুর এবং মাছ চাষে আগ্রহ ও কিছুটা জ্ঞানসম্পন্ন খামারীরা শিং মাছ বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে পারেন।



চিত্র ঃ শিং মাছ

পুকুরের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- রুই-জাতীয় মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত যে কোন পুকুরে যেখানে সারা বৎসরই কমপক্ষে ৪ ফুট পানি থাকে।
- ছয় ফুটের বেশি গভীর পানি না থাকাই বাঞ্ছনীয়।
- তলদেশ অতিরিক্ত কর্দম মুক্ত হতে হবে।
- বন্যামুক্ত এবং পুকুরের উপরিভাগে সারা দিনে কমপক্ষে ৮ ঘন্টা সূর্যের আলো সরাসরি পড়তে হবে।

পুকুর প্রস্তুতি

পাড় ও তলদেশ ঃ প্রয়োজনে পানি নিস্কাশন করে পুকুরের পাড় মেরামত ও তলদেশ অতিরিক্ত কর্দম মুক্ত করে সমান করতে হবে। অন্যথায় পুকুরের পানির গুণাগুণ দ্রুত খারাপ হতে পারে। তাছাড়া পরবর্তীতে মাছ আহরণ করা কঠিন হবে। এ কাজটি জানুয়ারি-মার্চ মাসে করা উচিত।

জলজ আগাছা ও আমাছাসহ রাক্ষুসে মাছ দূরীকরণ ঃ পানি প্রাপ্তি যদি সমস্যা না হয় সেক্ষেত্রে পুকুরের পানি নিস্কাশন করে সব জলজ আগাছা এবং আমাছাসহ রাক্ষুসে মাছ দূর করে নিতে হবে। অন্যথায় পুকুরে বারবার জাল টেনে জলজ উদ্ভিদ পরিস্কার এবং যতদূর সম্ভব সকল মাছ ধরে ফেলতে হবে। এরপর বাকি সব মাছ ধরার জন্য প্রতি শতক আয়তন এবং প্রতি ফুট পানির গভীরতার জন্য ২৫-৩০ গ্রাম হারে রোটেনন প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ ৫ ফুট পানির গভীরতার ৩০ শতকের পুকুরে ৩.৭৫-৪.৫ কেজি রোটেনন লাগবে। বাজারে সাধারণত ২ শক্তির রোটেনন (৯.১% ও ৭%) পাওয়া যায়। শক্তি বেশি হলে ব্যবহারের পরিমাণ কম হবে অর্থাৎ ৩.৭৫ কেজিই যথেষ্ট।

চুন প্রয়োগ ঃ প্রতি শতাংশে ১ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে। রোটেনন ব্যবহার করা হয়ে থাকলে প্রয়োগের ২/১ দিন পর চুন দিতে হবে। ৩০ শতক পুকুরের জন্য চুন লাগবে ৩০ কেজি।

সার প্রয়োগ ঃ চুন প্রয়োগের ৩/৪ দিন পর প্রতি শতকে পচা গোবর প্রায় ৬ কেজি, মুরগির বিষ্ঠা ৩ কেজি, ইউরিয়া ১২০ গ্রাম এবং টিএসপি ৯০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হবে। উল্লেখিত সার ৩০ শতক পুকুরের জন্য লাগবে ১৮০ কেজি গোবর, ৯০ কেজি মুরগির বিষ্ঠা, ৩.৬ কেজি ইউরিয়া এবং ২.৭ কেজি টিএসপি।

বেড়া স্থাপন ঃ পুকুরের চতুর্ধারের পাড়ের উপরিতলে ১ মিটার উঁচু বেড়া স্থাপন করলে ভাল হয় যেন মাছ বাহিরে বেরিয়ে যেতে না পারে।

পোনা মজুদ

পুকুর প্রস্তুতির ৪/৫ দিন পর যখন পানির রং সবুজ ধূসর ধারন করবে তখন পোনা মজুদ করা যাবে। পোনা মজুদ এপ্রিল-মে মাসে করাই উত্তম। পোনা পুকুরে ছাড়ার সময় পানির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য পোনা বহনকারী পাত্রের পানি পুকুরের পানির সাথে কিছুটা সময় নিয়ে অল্প অল্প করে পরিবর্তন করতে হবে যেন পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পিএইচ ক্রমশ পুকুরের পানির মত হয়ে যায়।

মজুদ হার

প্রতিটি প্রায় ৪ গ্রাম ওজনের বা ৫ সেমি আকারের ৬০০ পোনা প্রতি শতকে মজুদ করতে হবে। সে হারে ত্রিশ শতক পুকুরের জন্য পোনার সংখ্যা হবে ১৮,০০০ এবং যার আনুমানিক মোট ওজন হবে ৭২ কেজি।

খাবার ব্যবস্থাপনা

বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত পাঙ্গাস মাছের জন্য দেয় খাদ্য (৩৫-৪০% আমিষ সমৃদ্ধ) বাজার থেকে ক্রয় করে শিং মাছ চাষে প্রয়োগ করা যায় অথবা সারণী-২ এর দু'টি মিশ্রণের যে কোন একটি চাষীর বাড়িতে তৈরি করে ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনে মানসম্পন্ন তৈরি খাদ্য প্রাপ্তির ব্যাপারে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

সারনী-১ঃ খাদ্য উপকরণ ও মিশ্রণ প্রণালী

খাদ্য উপকরণ	মিশ্রণ-১ (%)	মিশ্রণ-২ (%)
মৎস্যচূর্ণ	৪০	২৫
হাড় ও মাংস চূর্ণ	০	২৫
সরিষাল খৈল	২০	২০
চালের কুড়া (অটোমিলের)	২০	২০
গমের ভুষি	১৫	১৫
গুড়	৪	৪
ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ	১	১

পুকুরে পোনা মজুদের ২/১ দিন পর হতে ১৫ দিন অন্তর অন্তর মোট দৈহিক ওজনের উপর ভিত্তি করে খাবারের পরিমাণ নির্ধারণ করে সে খাবার দিনে দুইবার সমভাগ করে পুকুরে দিতে হবে। পুকুরে খাবার দেয়ার নিয়মাবলী (৩০ শতক আকারের পুকুর) সারণী-৩ এ দেয়া হলো।

মাছ ধরা ও বিক্রয়

- আট/নয় মাসে মাছ বিক্রয় উপযোগী হয়ে যায়। ৭ম মাস হতে আংশিক আহরণ শুরু করা যায়। সেই মাস হতেই পুনঃমজুদ শুরু করে ৯ম মাসেও চাষাবাদ অব্যাহত রাখা যাবে।
- মাছ ধরার জন্য ঝাঁকি জাল বা বেড় জাল ব্যবহার করা যাবে। সকল মাছ ধরতে পুকুরের পানি নিস্কাশনের প্রয়োজন পড়বে।
- সকালে মাছ ধরা উত্তম।

মাছের প্রাক্কলিত বৃদ্ধির হার, মোট ওজন ও দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ (পোনা ছাড়ার দিন মাছের সংখ্যা ১৮,০০০ এবং মোট ওজন ৭২ কেজি - প্রতিটি পোনা মাছের গড় ওজন ৪ গ্রাম হিসেবে)। ৩০ শতাংশ পুকুরে দৈনিক খাদ্য প্রয়োগ তালিকা

মাস (মাছ ছাড়ার পর)	পুকুরে মাছের বয়স ও খাবার দেয়ার সময়কাল	মাছের প্রাক্কলিত ওজন (কেজি)	প্রাক্কলিত দেয় দৈনিক খাবারের পরিমাণ পক্ষের শুরুতে ওজনের ভিত্তিতে	প্রতি ১৫ দিনের খাবারের পরিমাণ (কেজি)
১ম	০১-১৫ দিন	৭২-১০৪	৪.৩২ কেজি (মোট ওজনের ৬% হারে)	৬৪.০০
	১৬-৩০ দিন	১০৪-১৪২	৫.১৮ কেজি (পূর্বের সাথে ২০% যোগ করে)	৭৭.০০
২য়	৩১-৪৫ দিন	১৪২-২০৫	৫.৬৮ কেজি (মোট ওজনের ৪% হারে)	৮৫.০০
	৪৬-৬০ দিন	২০৫-২৪৮	৬.৮২ কেজি (পূর্বের সাথে ২০% যোগ করে)	১০২.০০
৩য়	৬১-৭৫ দিন	২৪৮-৩০০	৭.৪৪ কেজি (মোট ওজনের ৩% হারে)	১১২.০০
	৭৬-৯০ দিন	৩০০-৩৫৬	৮.৯৩ কেজি (পূর্বের সাথে ২০% যোগ করে)	১৩৪.০০

মাস (মাছ ছাড়ার পর)	পুকুরে মাছের বয়স ও খাবার দেয়ার সময়কাল	মাছের প্রাক্কলিত ওজন (কেজি)	প্রাক্কলিত দেয় দৈনিক খাবারের পরিমাণ পক্ষের শুরুতে ওজনের ভিত্তিতে	প্রতি ১৫ দিনের খাবারের পরিমাণ (কেজি)
৪র্থ	৯১-১০৫ দিন	৩৫৬-৪১৬	১০.৬৮ কেজি (মোট ওজনের ৩% হারে)	১৬০.০০
	১০৬-১২০ দিন	৪১৬-৪৯৮	১১.৭৫ কেজি (পূর্বের সাথে ১০% যোগ করে)	১৭৬.০০
৫ম	১২১-১৩৫ দিন	৪৯৮-৫৮৩	১৪.৯৪ কেজি (মোট ওজনের ৩% হারে)	২২৪.০০
	১৩৬-১৫০ দিন	৫৮৩-৬৩৫	১৬.৪০ কেজি (পূর্বের সাথে ১০% যোগ করে)	২৪৬.০০
৬ষ্ঠ	১৫১-১৬৫ দিন	৬৩৫-৬৮৬	১৯.০৫ কেজি (মোট ওজনের ৩% হারে)	২৮৬.০০
	১৬৬-১৮০ দিন	৬৮৬-৭৩৪	২০.৯৫ কেজি (পূর্বের সাথে ১০% যোগ করে)	৩১৪.০০
৭ম	১৮১-১৯৫ দিন	৭৩৪-৭৭৮	২২.০২ কেজি (মোট ওজনের ৩% হারে)	৩৩০.০০
	১৯৬-২১০ দিন	৭৭৮-৮১৭	২৪.০০ কেজি (পূর্বের সাথে ১০% যোগ করে)	৩৬০.০০
৮ম	২১১-২২৫ দিন	৮১৭-৮৫০	২৪.৫১ কেজি (মোট ওজনের ৩% হারে)	৩৬৮.০০
	২২৬-২৪০ দিন	৮৫০-৮৭৫	২৬.৯৫ কেজি (পূর্বের সাথে ১০% যোগ করে)	৪০৪.০০
	৮ম মাস শেষে	মোট ওজন ৮৭৫ কেজি	**মোট খাবারের পরিমাণ**	**৩,৪৪২.০০**

বিঃ দ্রঃ ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম ও ৮ম মাসের প্রথম দিনে অর্থাৎ মাছ ছাড়ার ৩১, ৬১, ১২১, ১৫১, ১৮১ ও ২১১ তম দিনে ঝাঁকি জাল দিয়ে মাছ ধরে মাছের গড় ওজন নির্ণয় করে খাবারের পরিমাণ সমন্বয় করতে হবে। মাঠ পর্যায়ের খাদ্য ও পানির গুণাগুণের ভিত্তিতে মাছের মোট ওজনের তারতম্য হতে পারে।

সারনী-২ঃ শিং মাছের প্রাক্কলিত উৎপাদন ব্যয়, মোট আয় ও মুনাফার বিবরণী (৩০ শতক পুকুর, ৮ মাসে)

(ক) ব্যয়	**টাকা**
পুকুর প্রস্তুতি (পাড় মেরামত, অতিরিক্ত কাদা সরানো, আগাছা ও আমাছা মুক্ত করা, রোটেনন প্রয়োগসহ)	১,০০০.০০
চুন ক্রয়-৩০ কেজি × ১৫.০০ টাকা/কেজি	৪৫০.০০
সার ক্রয়: গোবর +মুরগির বিষ্ঠা-২৭০ কেজি × ১.৫০ টাকা/কেজি	৪০৫.০০
ইউরিয়া ৩.৬ কেজি × ২.০০ টাকা/কেজি	৪২.০০
টিএসপি ২.৭ কেজি × ৪০.০০ টাকা/কেজি	১০৮.০০
পোনা ক্রয় ঃ ১৮০০০টি (প্রতিটি পোনা ২.০০ টাকা হিসেবে)	৩৬,০০০.০০
খাবার ক্রয় ঃ ৩,৪৪২ কেজি × ৩০.০০ টাকা/কেজি	১,০৩,২৬০.০০
অন্যান্য (জাল টানা, ঔষধ পত্র, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি)	৫,০০০.০০
মোট ব্যয়	**১,৪৬,২৬৫.০০**

(খ) আয়	**টাকা**
মাছ বিক্রি (৮৭৫ কেজি ও ২৯০.০০ টাকা/কেজি)	২,৫৩,৭৫০.০০
মোট আয়	**২,৫৩,৭৫০.০০**
(গ) নীট মুনাফা (খ-ক)	**১,০৭,৪৮৫.০০**

দেশিয় প্রজাতির মাগুর চাষ

এ পদ্ধতিতে বসতবাড়িতে সবজির জাংলার নিচে ছোট ডোবায় (১৫ বর্গ মিটার হতে ৪০ বর্গ মিটার) দেশীয় প্রজাতির মাগুর মাছ চাষ করা সম্ভব। এতে মাছ চাষের জন্য অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হবে না। শিং, মাগুর এবং কই মাছ এয়ার ব্রিদিং হওয়ায় কেবল এই তিন ধরণের মাছই বসতবাড়িতে ছোট ডোবায় চাষ করা সম্ভব। কেননা এরা ডোবার নিম্নমাত্রার দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং কম পানিতে বেঁচে থাকতে পারে। এই ধরণের মাছ চাষে সূর্যালোক জরুরী নয়। বসতবাড়িতে ডোবায় দেশীয় প্রজাতির মাগুর মাছ চাষের মাধ্যমে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক পরিবারের সদস্যদের পুষ্টিহীনতা (Malnutrition) দূর করা সম্ভব।



চিত্র ঃ মাগুর মাছের চাষ

ডোবার স্থান নির্বাচন

বসতবাড়িতে টিউবওয়েলের যতটা সম্ভব কাছাকাছি ডোবা খনন করতে হবে। সবজির জাংলার নিচে ডোবা খনন করা হলে মাছ চাষের জন্য অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হবে না।

ডোবার আকার ও গভীরতা

বসতবাড়িতে জায়গার প্রাপ্যতাভেদে ডোবার আকার ১৫ বর্গ মিটার হতে ৪০ বর্গ মিঃ বা এর বেশি হতে পারে। ডোবার গভীরতা ১.১৫-১.৩০ মিটার এবং পাড়ের উচ্চতা ও প্রশস্ততা যথাক্রমে ৩০-৪৫ সেমি হতে পারে।

পানির উৎস, প্রবেশ নির্গমন পথ

প্রতিদিন পরিবারের সদস্যদের গোসল ও অন্যান্য কাজে টিউবওয়েলের যে পানি ব্যবহার করা হয় তাই ডোবার পানির উৎস। তবে, এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সাবানযুক্ত পানি যেন ডোবায় প্রবেশ না করে। এছাড়া বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি ডোবার পানির উত্তম উৎস হতে পারে। টিউবওয়েলের পানি ডোবায় প্রবেশ করানোর জন্য তলায় পলিথিন বিছানো উন্মুক্ত নালা বা পিভিসি পাইপ বা বাঁশ দিয়ে প্রবেশ পথ তৈরি করতে হবে। অতিবৃষ্টিতে যাতে ডোবা প্লাবিত না হয় সেকারণে পানি বের করার জন্য পিভিসি পাইপ বা বাঁশ দিয়ে নির্গমন পথ তৈরি করতে হবে।

ডোবা তৈরি

টিউবওয়েলের পাড়ে যদি ডোবা থাকে সে ক্ষেত্রে তলা সমান করে নিতে হবে। অন্যথায় নতুন করে নির্ধারিত আকারে ও গভীরতায় ডোবা খনন করতে হবে।

- প্রথমেই ডোবার তলা ও পাড়ে শতাংশে ১ কেজি হারে চুন গুড়া করে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- ৩ থেকে ৪ দিন পর ডোবার তলায় প্রতি বর্গ মিটারে ১ কেজি হারে পঁচা গোবর বা কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে তলা সমান করে দিতে হবে। এর ৩ থেকে ৪ দিন পর ডোবায় পানি সরবরাহ করতে হবে।

পোনা সংগ্রহ ও মজুদ

- **পোনার উৎস ঃ** সরকারী মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাণিজ্যিক হ্যাচারী, নার্সারী, বিল ও প্লাবনভূমি, পুকুর ইত্যাদি।
- **পোনার আকার ঃ** ৩ থেকে ৫ গ্রাম বা এর চেয়ে বড় আকারের পোনা মজুদ করতে পারলে ভাল উৎপাদন পাওয়া যাবে।
- **মজুদ ঘনত্ব ঃ** প্রতি বর্গ মিটারে ৮-১০ টি পোনা মজুদ করা যেতে পারে।

খাদ্য প্রয়োগ

- **খাদ্য -১ ঃ** কুচি করা শামুক বা ঝিনুকের মাংস (পার্শ্ববর্তী বন্যা প্লাবিত এলাকা, নীচু ধানক্ষেত, পুকুর, বিল, হাওর, খাল হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে)।
- **খাদ্য-২ ঃ** চালের কুড়া (২০%), আটা (১০%), খৈল (৩৫%), কুচি করা পোল্ট্রি ওফাল বা শামুক বা ঝিনুকের মাংস (৩৫%)।
- **খাদ্যের হার ঃ** প্রথম দুই মাস মোট মাছের ওজনের ১০% হারে, ৩য় মাসে ৮% হারে এবং ৪র্থ মাস হতে আহরণপূর্ব সময় পর্যন্ত ৬% হারে সকালে ও বিকেলে ২ বেলা খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- প্রাপ্যতা অনুসারে ১ নং খাদ্য সকালে এবং ২ নং খাদ্য বিকেলে অথবা যে কোন এক প্রকারের খাদ্য ব্যবহার করে মাছ চাষ করা যাবে।

চাষের সময়কাল

- ৩ মাসের মধ্যে মাছ খাবার উপযোগী হবে। ৪ থেকে ৬ মাস চাষ করলে ভাল উৎপাদন পাওয়া যাবে।
- শীতকালে মাগুর মাছ বৃদ্ধি পায় না। সে জন্য এ সময়ে চাষ লাভজনক নয়।
- চাষীর চাহিদা অনুযায়ী বছরে ১ থেকে ২ বার বসতবাড়ির ডোবায় এ মাছের চাষ সম্ভব। ডোবায় পানির নির্গমন পথ না থাকলে ডোবা প্লাবিত হয়ে মাছ ভেসে যেতে পারে।

উৎপাদন

মাঠ পর্যায়ে বসতবাড়িতে ৪০ বর্গ মিটার আকারের ডোবায় প্রায় ১ গ্রাম ওজনের ৪০০ পোনা মজুদ করে ৩ মাসে প্রতি শতাংশে ৬.৫ থেকে ৮.৫ কেজি উৎপাদন পাওয়া যায়। তবে পোনার ওজন ৩-৫ গ্রাম হলে ভাল হয় এবং সময়কাল বেশি হলে উৎপাদন বেশি হয়।

সারনী-১ঃ মাগুর মাছের প্রাক্কলিত ব্যয়, মোট আয় ও মুনাফা বিবরণী (প্রতি শতক ডোবায় ৩ মাসে)

(ক) ব্যয়	টাকা
ডোবা খননের জন্য ৫ জন শ্রমিক × ২ দিন × ২০০.০০	২,০০০.০০*
চুন ক্রয় ঃ ১ কেজি	৮.০০
পলিথিন ২ গজ	১০০.০০
বাঁশ ৮ ফিট	৫০.০০
পোনা ক্রয় ঃ ৪০০টি	৪০০.০০
খাবার ক্রয় (৩ মাস) ঃ ১ নং খাদ্য বাবদ	-
খাবার ক্রয় ২ নং খাদ্য ,, (২০ কেজি × টাকা ১০.০০)	২০০.০০
খাবার ক্রয় ১নং খাদ্য ১ বেলা এবং ২ নং খাদ্য ১ বেলা	১০০.০০
মোট ব্যয়	**২,৮৫৮.০০**

(খ) আয়	টাকা
মাছ বিক্রি (৮.৭৫ কেজি ও ৩০০.০০ টাকা হিসেবে)	২,৫৫০.০০
মোট ব্যয় প্রতি শতাংশে (৩ মাসে)	৬০৮.০০
(গ) নীট মুনাফা (খ-ক)	**১,৬৯২.০০**

পুকুরে পাঙ্গাস মাছের চাষ

মাছের বৈশিষ্ট্য

পুকুরে পাঙ্গাস প্রতিকুল পরিবশে বাঁচতে পারে ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শিকারী মাছ নয় বলে রুই জাতীয় মাছের সাথে মিশ্র চাষ করা যায়। সর্বভুক মাছ বলে যে কোন সম্পূরক খাদ্য দিয়ে চাষ করা যায়। প্রতিকূল পরিবেশে অধিক ঘনত্বে চাষ করা যায় বলে রুই জাতীয় মাছের চেয়ে উৎপাদন অনেক বেশি।



চিত্র ঃ পাঙ্গাস মাছের চাষ

পুকুর প্রস্তুতি

১৫-২০ সেমি গভীরতা সম্পন্ন পুকুর পাঙ্গাস মাছ চাষের জন্য উপযোগী। রাক্ষুসে/অবাঞ্চিত মাছ জাল টেনে বা পুকুর শুকিয়ে অথবা প্রতি শতাংশে ১৬০ গ্রাম হারে রোটেনন পাউডার প্রয়োগ করে দমন করতে হবে। প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের ১৫ দিন পর প্রতি শতাংশে ৪০ কেজি গোবর অথবা ২০ কেজি হাঁস/মুরগির বিষ্ঠা ও ২৬০ গ্রাম ইউরিয়া + ১৬০ গ্রাম টিএসপি প্রয়োগ করতে হবে।

পোনা মজুদ

সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পোনা মজুদ করা যায়। একক চাষের ক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে ৫-৮ সেমি সাইজের ৫০-৬০টি পোনা মজুদ করা যেতে পারে। মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে ৫-৮ সেমি সাইজের ৩০-৩৫টি পাঙ্গাসের পোনা এবং ১২-১৫টি রুই, ৮-১২টি কাতলা এবং ১০-১২টি সিলভার কার্প মজুদ করা যেতে পারে। আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ৬০-৮০টি পাঙ্গাসের পোনা মজুদ করা যেতে পারে। পাঙ্গাস ও রুই জাতীয় পোনা মজুদের অনুপাত ৫০ঃ৫০ অথবা ৬০ঃ৪০ কিংবা ৮০ঃ২০ হারে হতে পারে।

খাদ্য প্রয়োগ

পাঙ্গাস চাষে প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষ (২৫-৩০%) সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। শুটকি মাছের মাছের গুঁড়ো প্রাণিজ আমিষ হিসেবে ভাল। শামুক, ঝিনুক, গবাদি পশুর নাড়ি-ভুঁড়ি কুচি কুচি করে কেটে বা রক্তের গুঁড়ো প্রয়োগ করেও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা যায়।

উৎপাদন

রুই জাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষে এক বছরে পাঙ্গাস গড়ে ১-১.২৫ কেজি হয়। প্যাঙ্গাস মাছের একক চাষে ৭-৮ টন/হেক্টর উৎপাদন পাওয়া যায়। মিশ্রচাষে ১০-১২ টন/হেক্টর উৎপাদন পাওয়া যায়। আধা-নিবিড় চাষে ১৮-২০ টন/হেক্টর পর্যন্ত উৎপাদন পাওয়া সম্ভব।

আয়-ব্যয়

একক চাষে প্রকৃত মুনাফা প্রতি হেক্টরে ৪-৫ লক্ষ টাকা। মিশ্রচাষে এ মুনাফা ৮-১০ লক্ষ টাকা/হেক্টর।

ব্যবহার সম্ভাবনা ও পরামর্শ

ছোট-বড় যে কোন পুকুরে পাঙ্গাসের একক এবং মিশ্র চাষ করা যায়। অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল পরিবেশেও এ মাছ চাষ করা যায়। পাঙ্গাস মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত অধিক ঘনত্বে পোনা মজুদ না করাই ভাল। নিয়মিত আমিষ সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য খাবার প্রয়োগ করতে হবে। অধিক উৎপাদনের জন্য নিয়মিত পানির গুণাগুণ এবং মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।

মৌসুমী পুকুরে রাজপুঁটির চাষ

রাজপুঁটি এদেশে একটি জনপ্রিয় মাছ। ফলনের দিক থেকে এ মাছটি অন্য যে কোন দেশীয় পুঁটির চেয়ে অধিক উৎপাদনশীল বলে এর নাম দেয়া হয়েছে রাজপুঁটি। অতি অল্প খরচে ও সহজে ব্যবস্থাপনায় এ মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষ করা যায় বলে এর চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটছে। বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্রে উদ্ভাবিত অধিক উৎপাদনশীল উন্নতজাত রাজপুঁটি মাছ চাষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।



চিত্র ঃ রাজপুঁটি মাছ

বৈশিষ্ট্য

অধিক উৎপাদনশীল মাছ হওয়াও ৩-৬ মাসের মধ্যেই আহরণযোগ হয়। যে কোন প্রকার ডোবা বা পতিত পুকুরে এমনকি অপেক্ষাকৃত বিরূপ পরিবেশে বিশেষ করে ঘোলা পানিতেও এই মাছ চাষ করা যায়। রুই জাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষ করা যায়।

পুকুর প্রস্তুতি

সাধারণত: ১০-৩০ শতাংশের যে কোন মৌসুমী পুকুর যেখানে পানির গভীরতা ১-২ মিটার থাকে এমন পুকুর এই মাছ চাষের জন্য উপযোগী। পুকুরের পাড় মেরামত ও জলজ আগাছা পরিস্কার করে নিতে হবে। পুকুরে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে ৩-৪ দিন পর প্রতি শতাংশে ৩-৪ কেজি হারে গোবর সার প্রয়োগ করতে হবে। গোবর প্রয়োগের ৬-৭ দিন পর প্রতি শতাংশে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০০ গ্রাম টিএসপি পানিতে গুলিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।

পোনা মজুদ

সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর ৫-৮ সেমি আকারের ৮-১০ গ্রাম ওজনের পোনা প্রতি শতাংশে ৬০-৬৫ টি হারে মজুদ করা যেতে পারে। মাছ ছাড়ার দিন থেকে মাছের দেহ ওজনের শতকরা ৪-৫ ভাগ হারে চাউলের কুঁড়া ও সরিষার খৈল (২ঃ১) খাদ্য হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। সম্পূরক খাদ্যের পাশাপাশি পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার উৎপাদনের জন্য প্রতি ৭ দিন পর পর পুকুরে ৪ কেজি গোবার গুলিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।

মাছ আহরণ

উল্লেখিত চাষ পদ্ধতিতে ৫-৬ মাসে ১৫০-২০০ গ্রাম ওজনের রাজপুঁটি আহরণ করা যায়।

উৎপাদন ও আয়-ব্যয়

আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করে ৫-৬ মাসে হেক্টর প্রতি ১,৮০০ থেকে ২,০০০ কেজি মাছ উৎপাদন করা যায় যা থেকে ৬০,০০০.০০ - ৮০,০০০.০০ টাকা মুনাফা করা সম্ভব।

ব্যবহার সম্ভাবনা ও পরামর্শ

বাংলাদেশের গ্রামে বাড়ির আশে পাশে ছোট ও মাঝারী আকারের অনেক ডোবা ও পুকুর অনাবাদী অবস্থায় থাকে যেখানে রুই জাতীয় মাছ চাষ লাভজনক নয়। এই সব মৌসুমী পুকুরে স্বল্প পুঁজি, কম সময় ও সহজ ব্যবস্থাপনায় রাজপুঁটি মাছ চাষ করে একজন চাষী মাছের চাহিদা ও বাড়তি আয়ের সংস্থান করে নিতে পারেন। মৌসুমী ডোবা-নালা কিংবা অন্যান্য জলাশয় পতিত ফেলে না রেখে সেখানে রাজপুঁটির চাষ লাভজনক। উৎপাদিত মাছ হতে পরিবারের মাছের চাহিদা মিটিয়েও অতিরিক্ত মাছ বিক্রয় করে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান হতে পারে।

পুকুরে হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষ

পুকুরে হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষে মাছের জন্য সার ও সম্পূরক খাবারের প্রয়োজন হয় না। একই জায়গা থেকে মাছ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন এবং অল্প জায়গা থেকে স্বল্প ব্যয়ে অধিক আমিষ পাওয়া যায়।



চিত্র ঃ পুকুরে হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষ

পুকুর প্রস্তুতি

এমন পুকুর নির্বাচন করতে হবে যাতে ৮-১০ মাস পানি থাকে এবং পুকুরের গভীরতা অন্তত পক্ষে ৪-৬ ফুট থাকে। প্রাথমিকভাবে পুকুর থেকে রাক্ষুসে মাছ দূর করতে হবে। প্রতি শতাংশে ১৬০ গ্রাম রোটেনন ব্যবহারে পুকুর রাক্ষুসে মাছ মুক্ত করা যায়। মাছের পোনা ছাড়ার আগে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন দিতে হবে।

হাঁসের ঘর নির্মাণ

পুকুর প্রস্তুতির পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত বাঁশ ও ছন দিয়ে পুকুরের উপরে ঘর তৈরি করা যায়। প্রতিটি হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট জায়গা হিসেবে ঘর তৈরি করতে হবে। ঘরের উচ্চতা ১.২৫-১.৬০ সেমি হওয়া এবং ঘর তৈরির সময় মেঝেতে বাঁশের বাতা ১ সেন্টিমিটার পর পর ফাঁকা করে তৈরি করতে হবে।

হাঁস স্থানান্তর

যে প্রজাতির হাঁস বেশি ডিম দেয় সাধারণত ঐগুলি নির্বাচন করা উচিত। খাকী ক্যাম্বেল অথবা ইন্ডিয়ান রানা হাঁস নির্বাচন করা যেতে পারে। জলাশয়ের প্রতি শতাংশে ২টি করে হাঁস পালন করতে হবে। হাঁসের ঘর সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে। হাঁসকে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রতিদিন ১১০ গ্রাম করে (ভাঙ্গা গম, গমের ভূসি, চালের কুড়া, তিলের খৈল, সয়াবিন খৈল ও মাছের গুড়া) খাবার হিসেবে দিতে হবে।

মাছ মজুদ

একাধিক প্রজাতির মাছের পোনা যেমন- সিলবার কার্প ৩০%, কাতলা ১০%, রুই ২৫%, মৃগেল ২৫%, কার্পিও ৫% এবং গ্রাস কার্প ৫% হারে ৭-১০ সেমি আকারের পোনা ২৪-৪০ টি প্রতি শতাংশে মজুদ করতে হবে। তাছাড়া প্রতি শতাংশে অতিরিক্ত ১০-১৫টি রাজপুঁটি মজুদ করা যেতে পারে।

আহরণ ও উৎপাদন

৭-৮ মাস চাষ করার পর প্রতিটি মাছ বিক্রয়যোগ্য হয়। তবে রাজপুঁটির বেলায় মজুদের ২ মাস পর থেকেই আহরণযোগ্য হয়। প্রতি শতাংশে ২৪ কেজি মাছ উৎপাদন পাওয়া সম্ভব এবং খাকী ক্যাম্বেল বছরে ২৫০-৩০০টি ডিম দিয়ে থাকে।

ব্যবহার সম্ভাবনা ও পরামর্শ

বসতবাড়ির পাশে যে কোন মেয়াদী পুকুর যাতে সারা বৎসর পানি থাকে সেখানে এই সমন্বিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ ও হাঁস দু'টোই চাষ করা যেতে পারে। নিয়মিত হাঁসকে টিকা দিতে হবে। হাঁসের ঘর নিয়মিত পরিস্কার রাখতে হবে। পুকুরে অধিক ঘনত্বে মাছ মজুদ করা ঠিক হবে না। মাঝে মাঝে জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।

অন্যান্য প্রযুক্তি

মৌমাছি পালন

মৌমাছি পালন কঠিন কাজ নয়। এ বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকলে পারিবারিকভাবে ঘরের গৃহিনী এমনকি ছেলে-মেয়েরাও মৌমাছি পালন করতে পারে। এভাবে মৌমাছি পালনের জন্য কোন বড় জায়গারও প্রয়োজন হয় না। বসতবাড়ির ভিটায় অথবা ঘরের খোলা বারান্দায় সুবিধামত একটু নির্জন জায়গায় কম পরিশ্রমে মৌমাছি পালন করা যায়। বিশেষ করে এদেশের ভূমিহীন কৃষকরা নিজ নিজ বসতবাড়িতে মৌমাছি পালন করে অল্প পুঁজিতে বেশ কিছু অর্থ আয় করতে পারেন। ভাল ব্যবস্থাপনায় একটা বাক্সের মৌচাক থেকে বছরে ১০-১২ কেজি মধু সংগ্রহ করা যায়, যার দাম কমপক্ষে ১৫০০.০০ টাকা। এজন্য শুধু প্রয়োজন হবে একটি বাক্সের ও একটি মৌকলোনি। এ ধরনের বাক্সের দামও তেমন বেশি নয়।

মৌমাছির জাত

মৌমাছি চার প্রকার। যথাঃ (১) এপিস ডরসাটা (২) এপিস মেলিফেরা (৩) এপিস সেরেনা ইন্ডিকা এবং (৪) এপিস ফ্লোরা। উল্লেখিত চার প্রকার মৌমাছির মধ্যে আমাদের দেশে এপিস সেরেনা ইন্ডিকা মৌমাছির চাষ করা হয়ে থাকে।

মৌচাষের পরিবেশ ও স্থান নির্বাচন

মৌচাষকে লাভজনক করতে হলে অবশ্যই নিম্নলিখিত কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে হবে ঃ

- ত্রুটিমুক্ত মৌবাক্স ব্যবহার করতে হবে।
- ৮০-৯০ সেমি উঁচু স্ট্যান্ড, খুঁটি বা টুলের উপর মৌবাক্স বসাতে হবে এবং স্ট্যান্ডের তলায় জলকান্দা ব্যবহার করতে হবে।
- গরমকালে বাক্স গাছের ছায়ায় কিংবা ছন, খড় বা গোলপাতার ছাউনী দেয়া ঘরে রাখতে হবে এবং শীতকালে চট, ছালা বা ডামি বোর্ড ব্যবহার করতে হবে।
- যে সব ফসল বা গাছের ফুলে যথেষ্ট মধু পাওয়া যায় সে সমস্ত ফসল বা গাছ যাতে আশে-পাশে প্রচুর থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- কোনভাবেই যাতে মৌমাছি চলাচলের বাধা সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে এবং অযথা যখন তখন কেউ মৌমাছিকে বিরক্ত না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- যথাসময়ে নিয়মিত মৌবাক্স পর্যবেক্ষণ করতে হবে ও মৌবাক্সের কাছে পরিস্কার পানি রাখতে হবে।

মৌবাক্স ও কলোনি স্থাপন

আমাদের দেশে প্রচলিত 'নিউটন হাইভকেই' আধুনিক মৌবাক্স বলা হয়। সঠিক মাপের মৌবাক্স না হলে মৌমাছিদের স্বাভাবিক কাজ কর্মে ব্যাঘাত ঘটে। একটি আধুনিক মৌবাক্সের বিভিন্ন অংশের নাম ও মাপ সারণী-১ এ দেয়া হলো।



চিত্র ঃ মৌমাছি

সারনী-১ঃ মৌবাক্সের বিভিন্ন অংশের মাপ

খাদ্য উপকরণ	মাপ (মিলিমিটার)			
	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	উচ্চতা	কাঠের ঘনত্ব
তলার কাঠ	৪৪৪	২৭৯	-	২৫.৪
বাচ্চা ঘর	২৮৬	২৭৭	১৭৪	২৫.৪
মধু ঘর	২৮৬	২৭৭	১০৫	২৫.৪
বাচ্চা ঘরের ফ্রেম (ক) টপবার	২৫২	২০	-	১০
(খ) সাইট বার	১৫০	৩০	-	১৩
(গ) বটম বার	২২৮	১৩	-	১০
মধু ঘরের ফ্রেম (ক) টপবার	২৫২	২০	-	১০
(খ) সাইট বার	৮৫	৩০	-	১৩
(গ) বটম বার	২২৮	১৩	-	১০
ভেতরের ঢাকনা	২৮৫	২৭৬	-	১৮
বাহিরের ঢাকনা	৩৩০	৩২১	১১০	২৫.৪

মৌচাষের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি





চিত্র ঃ মৌ বাক্স

- **স্ট্যান্ড বা টুল ঃ** মৌকলোনি সংগ্রহের পর মৌবাক্সে স্থাপন করে তা স্ট্যান্ড বা টুলের উপর উপযুক্ত পরিবেশে রাখতে হবে। এ উচ্চতা প্রায় ১ মিটার হলে মৌবাক্সে কলোনি পর্যবেক্ষণের সুবিধা হয়।
- **মুখোশ ঃ** নতুন কলোনি ধরা এবং বাক্সে মৌমাছি দেখাশোনার সময় শ্রমিক মৌমাছি উত্তেজিত হয়ে হুল ফুটিয়ে দিতে পারে। মুখোশ পরে কাজ করলে হুল থেকে মুখ রক্ষা পাবে। কেনভাস বা নেটের কাপড় দিয়ে মুখোশ তৈরী করা যায়।
- **হাত মোজা ঃ** মৌমাছি যাতে হাতে হুল ফুটাতে না পারে তার জন্য হাত মোজা ব্যবহার করতে হয়। কেনভাস জাতীয় কাপড় বা রেক্সিন দিয়ে হাত মোজা তৈরি করা যায়।
- **কোট বা জ্যাকেট ঃ** হুল থেকে শরীর বাঁচানোর জন্য কোট বা জ্যাকেট ব্যবহার করা যেতে পারে।
- **ধুঁয়াদানী ঃ** গাছের ফোকর বা গর্ত থেকে মৌমাছি ধরা বা কলোনি দেখাশোনার সময় ধুঁয়া দিতে হয়। ধুঁয়া দিলে গর্ত থেকে সহজেই মৌমাছি বের হয়ে আসে। টিন দিয়ে ধুঁয়াদানী তৈরি করা যায়।
- **জলকান্দা ঃ** স্ট্যান্ড বা টুল অবশ্যই জলকান্দার উপর বসাতে হবে। তা না হলে পিঁপড়া, টিকটিকি বা তেলাপোকা মৌকলোনি আক্রমণ করবে।
- **মৌমাছি ধরার জাল ঃ** প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে মৌমাছি ধরা বা কলোনি স্থানান্তরের সময় এই জাল ব্যবহার করতে হয়। মশারীর নেট দিয়ে এই জাল তৈরি করা যায়।
- **মধু নিস্কাশন যন্ত্র ঃ** চাক থেকে মধু সংগ্রহ করার জন্য মধু নিস্কাশন যন্ত্র ব্যবহার করলে চাক নষ্ট হয় না ফলে মৌমাছি তাড়াতাড়ি আবার ঐ চাকে মধু জমানো শুরু করতে পারে। গ্যালভানাইজিং টিন দিয়ে বিশেষ উপায়ে মধু নিস্কাশন যন্ত্র তৈরি করা যায় ।

কলোনি স্থাপন

কলোনি স্থাপনে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে ঃ

মৌমাছি সহজে যাতায়াত করতে পারে এমন স্থানে কলোনী স্থাপন করতে হবে। কীটপতংগের আক্রমণ থেকে কলোনি রক্ষার জন্য জলকান্দীর উপর স্ট্যান্ড বা টুলের পায়া বসাতে হবে। কলোনি স্থাপনের পরপরই কৃত্রিম খাবার দিতে হবে। এক ভাগ চিনি এক ভাগ পানিতে জ্বাল দিয়ে কৃত্রিম খাবার প্রস্তুত করা যায়। চিনির সিরা পিরিচে দিয়ে তার উপর একটা পরিস্কার পাতলা কাপড় বিছিয়ে দিলে মৌমাছি সহজেই তা খেতে পারবে। কাপড় দিয়ে ঢেকে না দিলে মৌমাছির শরীর ও পাখায় চিনির সিরা লেগে যেতে পারে। তাতে মৌমাছির উড়ার শক্তি কমে যাবে, এমনকি মার ও যেতে পারে। কুইন গেইট লাগিয়ে রাখতে হবে যেন রাণী চাক ছেড়ে চলে যেতে না পারে। প্রয়োজন ছাড়া বাক্স বন্ধ রাখতে হবে এবং নাড়াচাড়া করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

পরিচর্যা

ঋতুভেদে মৌমাছির বিভিন্ন প্রকার পরিচর্যা করতে হয়।

বসন্তকালে করণীয়

শীতে ঠান্ডা থেকে বাঁচানোর জন্য প্যাকিং ব্যবহার করলে তা সরিয়ে ফেলা এবং পুরানো চাক সরিয়ে ডিম পাড়ার উপযোগী নুতন চাকের ব্যবস্থা করা।

গ্রীস্মকালে করণীয়

- রোদের তাপ ও গরম থেকে মৌমাছিকে রক্ষা করার জন্য বাক্সের উপর আচ্ছাদন ব্যবহার করা অথবা গাছে ছায়ায় স্থানান্তর করা।
- মধুফুল শেষ হয়ে আসলে মধু সংগ্রহের সময় সব মধু সংগ্রহ না করে ২/৩টি ফ্রেম রেখে দেয়া।
- ঝড়ে বাক্সের যেন ক্ষতি না হয় সে জন্য শক্ত করে বেঁধে দেয়া।
- এলাকায় মধুফুল না থাকলে কৃত্রিম খাদ্য সরবরাহ করা অথবা মধুফুল আছে এমন এলাকায় মৌবাক্স স্থানান্তর করা
- মৌমাছি যাতে বিশুদ্ধ পানি পায় তার ব্যবস্থা করা।

বর্ষাকালে করণীয়

- কলোনির সাপ্তাহিক দেখাশোনার কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিয়মিতভাবে করা।
- কলোনিতে খাবারের অভাব দেখা দিলে নিয়মিত কৃত্রিম খাবার দেয়া।
- বাক্সের তলা সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মোম পোকার আক্রমণ দেখা দিলে তা দ্রুত দমন করা।
- অনুপযুক্ত ও অপ্রয়োজনীয় চাক সরিয়ে ফেলা, পর্যবেক্ষণকালে ডিম ও বাচ্চাকে চাকের বাইরে বেশি সময় না রাখা।
- বোলতা, মাকড়শা, টিকটিকি, তেলাপোকা, পিঁপড়ে ইত্যাদি শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা।
- মৌবাক্সকে মাটির কাছাকাছি না রেখে উঁচু স্ট্যান্ডে রাখা যাতে বৃষ্টির পানি বা মাটির ভেজা বাতাস বাক্সে ঢুকতে না পারে।

শরৎ ও হেমন্তকালে করণীয়

- রাণী মৌমাছির ডিমপাড়ার স্থানসহ মধু জমা করার স্থান করে দেয়া অর্থাৎ প্রয়োজনে মধুঘর সরিয়ে দেয়া।
- দূর্বল কলোনিতে একত্র করে সবল করে তোলা এবং চাক নবায়ন, রাণী বদলানোর মত জরুরী কাজগুলো এ সময় করে নেয়া।

শীতকালে করণীয়

- বেশি ঠান্ডায় কলোনির ভেতরের তাপ স্বাভাবিক না থাকলে মৌমাছির বাচ্চা উৎপাদন যেমন কমে যাবে তেমনি বিভিন্ন ধরণের রোগও দেখা দিবে। এ সময় বাক্সের ঢোকার পথ ছোট করে দেয়া এবং শীতকালীন প্যাকিং এর ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে একাধিক ঢাকনা ব্যবহার করা।
- সকাল ও বিকালের রোদ যাতে ঢাকনার উপর পড়ে সে ব্যবস্থা নেয়া।
- ঠান্ডার সময় বাক্স খোলা ও পর্যবেক্ষণ না করা।
- মধু সংগ্রহরে প্রয়োজন হলে দিনের যে সময় ঠান্ডা কম থাকে সে সময় সংগ্রহ করা এবং পরে ভালভাবে আবার প্যাক করে দেয়া।
- প্রয়োজন ছাড়া বাক্স না খোলা এবং এলাকায় খাদ্যভাব থাকলে যেখানে প্রচুর ফুল আছে এমন স্থানে বাক্সটি স্থাপন করা। সম্ভব হলে কৃত্রিম খাদ্য প্রদান করা।

মধু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

মৌমাছি ফুল থেকে নেকটার সংগ্রহ করে। নেকটার হল মধুর প্রাথমিক উপাদান। এতে থাকে শতকরা ৮০ ভাগ পানি এবং ২০ ভাগ চিনি। আর নেকটার থেকে যখন পাকা মধু তৈরি হয় তখন তাতে থাকে শতকরা ২০ ভাগ পানি এবং ৮০ ভাগ চিনি। নেকটার থেকে মধু তৈরি মৌমাছির এক আশ্চার্যজনক কৌশল। মৌচাকের আয়-ব্যয়ের বিবরণী সারণী-২ এ দেয়া হলো।

সারনী - ২ ঃ একটি কলোনি মৌচাষের আয়-ব্যয়ের বিবরণী

(ক) ব্যয়	টাকা
প্রথম বছর ঃ	
মৌবাক্স	৩০০.০০
মৌকলোনি	২০০.০০
চিনি (৩ কেজি)	১০০.০০
ঔষধ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি	৫০.০০
দ্বিতীয় বছর ঃ	
চিনি (৩ কেজি)	১০০.০০
ঔষধ ও অন্যান্য	৫০.০০
মোট ব্যয়	**৮০০.০০**

(খ) আয়	টাকা
প্রথম বছরে মধু আহরণ ১০ কেজি × ১২০.০০ টাকা হিসাবে	১,২০০.০০
দ্বিতীয় বছরে মধু আহরণ ১০ কেজি × ১২০.০০ টাকা হিসাবে	১,২০০.০০
মোট আয়	**২,৪০০.০০**
(গ) নীট মুনাফা (খ-ক)	**১,৬০০.০০**

কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোষ্ট)

কেঁচো সার একটি পরিবেশ বান্ধব ও লাগসই জৈব সার। এ সার সকল মাঠ ফসল, ফুল, ফল ও শাকসবজিতে ব্যবহার করা যায়। উর্বরতা বৃদ্ধিসহ এ সার মাটির ভৌতিক, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলীর উন্নয়ন সাধন করে। এ সার ব্যবহারে রাসায়নিক সারের ব্যবহার শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত সাশ্রয় করা সম্ভব। জৈবিক (Organic) কৃষিতে এ সার বিশেষ অবদান রাখতে পারে।



চিত্র ঃ মাটির পাত্রে কেঁচো সার তৈরি

কেঁচো সার তৈরিতে ব্যবহৃত জৈব পদার্থগুলো হলো গোবর/মুরগীর বিষ্ঠা, বায়ো স্লারী, খড়, পচনশীল আবর্জনা, লতাপাতা ইত্যাদি। কেঁচো এগুলো খেয়ে মল ত্যাগ করে। এছাড়াও তার দেহ হতে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। এগুলো জৈব পদার্থের সাথে মিশ্রিত হয়ে পুষ্টিমান বাড়িয়ে দেয়। সকল মিশ্রণ একত্রে একটি উন্নত জৈব সার হিসেবে পরিণত হয়। এ সারকে আমরা কেঁচো সার বা ভার্মি কম্পোষ্ট বলতে পারি।

সারনী-১ঃ কেঁচো সার এবং অন্যান্য প্রচলিত জৈব সারের পুষ্টিমানের শতকরা হার এর তুলনা

জৈব সার	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশ
কেঁচো সার	২.৫-৩.০	১.০-১.৫	১.৫-২.০
গোবর	০.৫১-১.৫	০.৪-০.৮	০.৫-১.৯
মুরগির বিষ্ঠা	১.৬	১.৫	০.৮৫
কম্পোষ্ট (সাধারণ)	০.৪-০.৮	০.৩-০.৬	০.৭-১.০
খামারজাত সার	০.৫-১.৫	.০৪-.০৮	০.৫-১.৯
কম্পোষ্ট (কচুরিপানা)	৩.০	২.০	৩.০

সারনী-২ঃ কেঁচো সারের উপকরণ ও ক্রয় মূল্য

উপকরণ	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
ঘর তৈরি (১৫ ফিট × ১০ ফিট × ৭ ফিট)	১টি	১২,৫০০.০০	১২,৫০০.০০
কেঁচো ক্রয়	২ কেজি	১,৫০০.০০	৩,০০০.০০
মাটির গামলা (ব্যাস ৩০ ইঞ্চি এবং গভীরতা ১৫ ইঞ্চি)	৯টি	১৮০.০০	১,৬২০.০০
অন্যান্য খরচ			৮০০.০০
		মোট খরচ	১৭,৯২০.০০

কেঁচো সার তৈরির পদ্ধতি

- বর্জ্যসমূহকে (রান্না ঘরের বজর্য্য, পাতা, খড়) মাটির গর্তে ঢেকে রেখে অথবা কালো পলিথিনে মুখ বন্ধ করে বায়ুশূণ্য অবস্থায় ৭/৮ দিন রাখতে হবে। গাজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর উন্মুক্ত স্থানে রেখে শুকিয়ে ৫০-৬০% আর্দ্রতায় আনতে হবে।
- কাঁচা গোবর ১০-১৫ দিন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মুক্ত অবস্থায় পঁচাতে হবে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে কখনই কাঁচা গোবর মাটির গামলায় দেয়া যাবে না। তাহলে সব কেঁচো মরে যাবে। যেখানে মুরগির বিষ্ঠা পাওয়া সহজ সেখানে গোবরের পরিবর্তে মুরগির বিষ্ঠা ব্যবহার করা বেশি লাভজনক হবে। মুরগির বিষ্ঠাও প্রচলিত পদ্ধতিতে ১০-১৫ দিন পঁচাতে হবে।

- পঁচন এবং গাজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সকল বর্জ্য (গোবর/মুরগির বিষ্ঠা, রান্নাঘরের বর্জ্য, পাতা, খড়) একত্রে মিশিয়ে ৯টি গামলায় সমানভাবে ভাগ করে প্রতিটিতে ২০০টি করে কেঁচো ছেড়ে দিতে হবে। এরপর ছালার চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে কেঁচো অন্ধকার জায়গায় থাকতে পছন্দ করে এবং অন্ধকারে ভালভাবে খেতে পারে।
- ২/১ দিন পর পর দেখতে হবে যে গামলায় পানি শুকিয়ে গেছে কিনা। পানি শুকিয়ে গেলে অল্প পানি উপর দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- কেঁচো সার তৈরির গামলাগুলোতে কেঁচো দেয়ার আগেই ঘরের চারদিকে ড্রেন করে পলিথিন বিছিয়ে পানি দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যাতে পিঁপড়া কিংবা অন্যান্য পোকা-মাকড় কেঁচোগুলোকে খেয়ে ফেলতে না পারে। অথবা গামলাগুলোকে বড় জলবিড়া/পানি থাকে এমন পাত্রের উপর বসাতে হবে।

সারনী-৩ঃ কেঁচো সার তৈরিতে মাসিক খরচ ও আয়

(ক) ব্যয়	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
গোবর/মুরগির বিষ্ঠা	৮০০ কেজি	০.৫০	৪০০.০০
রান্না ঘরের বর্জ্য	৩০০ কেজি	১.০০	৩০০.০০
পাতা	১০ কেজি	১.০০	১০.০০
খড়	২০ কেজি	৫.০০	১০০.০০
শ্রমিক খরচ	৩৮ ঘন্টা	২৫.০০	৯৫০.০০
		মোট	**১,৭৬০.০০**

(খ) আয়	পরিমাণ	একক মূল্য (টাকা)	মোট মূল্য (টাকা)
সার বিক্রয়	৫০০ কেজি শুষ্ক অবস্থায়	৭.০০	৩,৫০০.০০
কেঁচো বিক্রয়	৫০০ গ্রাম	১,৫০০.০০	৭৫০.০০
		মোট	**৪,২৫০.০০**
প্রতি মাসে লাভ (৪,২৫০.০০ - ১,৭৬০.০০) = ২,৪৯০.০০ টাকা			

কেঁচো সার সংগ্রহ

- কেঁচো সাধারণত বর্জ্য উপরের দিক থেকে খেতে শুরু করে। বর্জ্য পদার্থ যখন চা এর গুড়ার মত ঝুর ঝুরে হয় তখন বুঝতে হবে সার তৈরি হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে কেঁচোর মলই হলো সার যা কাস্ট নামেও পরিচিত। এ অবস্থায় চালুনি দিয়ে চেলে কোকুন (কেঁচোর ডিম) এবং ঝর ঝরা অংশ আলাদা করতে হবে। চালুনির ছিদ্র ০.৫ মিলিমিটার হলে ভাল হয়। প্রথম ধাপে কেঁচো সার তৈরি হতে ২০-২৫ দিন সময় লাগে।
- ১০-১৫% আর্দ্রতা সম্পন্ন অবস্থায় কেঁচো সার সংরক্ষণ করতে হবে। অর্থাৎ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে পলিথিনে সীল করে আটকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে সংরক্ষিত কেঁচো সার প্রায় এক বছর পর্যন্ত ভাল থাকে।
- ২০-২৫ দিন পর সার তৈরি হতে থাকবে। পুনরায় আবর্জনা তৈরি করে গামলায় কেঁচোগুলোকে ছেড়ে দিলে ২০/২৫ দিনের মধ্যে আবার পরিমাণমত সার সংগ্রহ করা যাবে।

কেঁচো সার ব্যবহার

এ সার জমি তৈরির সময় রাসায়নিক সারের মত ছিটিয়ে ও মাটির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। প্রতি শতাংশ জমিতে ১, ২ ও ৩য় বছরে যথাক্রমে ১৫, ৭.৫ এবং ৩.৭ কেজি সার ব্যবহার করতে হবে। সব সারের পরিমাণ মত কেঁচো সার ব্যবহার করা যেতে পারে। কম পুঁজি সম্পন্ন মহিলারা ঘরে বসেই এ ব্যবস্থা করতে পারেন। মাটির উর্বরতা যদি একাবারেই না থাকে তা হলে কেঁচো সারের পাশাপাশি প্রথম বছর ৭০% রাসায়নিক সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

কম্পোষ্ট বা আবর্জনা পঁচা সার তৈরির পদ্ধতি

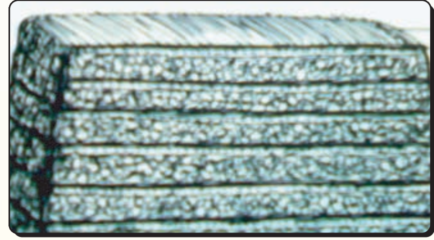
কম্পোষ্ট একটি উৎকৃষ্ট জৈব সার। এ সার ব্যবহার করলে জমির উর্বরতা বাড়ে, ফলে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া কৃষি পরিবেশের কোন ক্ষতি করে না বরং মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়তা করে। কম্পোষ্ট এর অপর নাম আবর্জনা পচা সার। এ সার তৈরির জন্য কচুরিপানা, ফসলের অবশিষ্টাংশ, খড়-কুটো, আগাছা, গৃহস্থালীর আবর্জনা, ঝরা পাতা এসব ব্যবহার করা যায়। কম্পোষ্ট সার দু'ভাবে তৈরি করা যায়, যেমন- স্তুপ পদ্ধতি ও গর্ত পদ্ধতি।

ক) স্তুপ পদ্ধতি

স্তুপ পদ্ধতিকে গ্রাম বাংলায় গাদা পদ্ধতি বলা হয়। বর্ষাকালে অথবা যেসব এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি, সেসব এলাকায় এ পদ্ধতি বেশ কার্যকর।

স্থান নির্বাচন

বসতবাড়ির আশপাশে, ক্ষেতের ধারে অথবা পুকুর বা ডোবার কাছে স্তুপ পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট তৈরি করা যাবে। খেয়াল রাখতে হবে, যেন স্থানটি বেশ উঁচু হয়, যাতে বর্ষার পানি জমে না থাকে। এ ধরনের উঁচু স্থানে যদি গাছের ছায়ার নিচে স্তুপ করা যায় তাহলে খুবই ভাল হয়। কারণ গাছের ছায়া রোদ বৃষ্টি প্রতিরোধ করবে এবং জৈব পদার্থের পচন ক্রিয়ায় সাহায্য করবে।



চিত্র ঃ স্তুপ পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট সার তৈরি

তৈরির নিয়ম

প্রথমে ৩-৪ দিনের শুকনো কচুরিপানা ও অন্যান্য আবর্জনা ফেলে ১৫ সেমি, পুরু স্তর সাজাতে হবে। এ ক্ষেত্রে তাজা বা সবুজ কচুরিপানা ব্যবহার উচিত নয়, এতে পটাশ ও নাইট্রোজেনের উপাদান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কচুরিপানা বেশি লম্বা হলে ১৫ সেমি করে কেটে ব্যবহার করতে হবে। এরপর এ স্তরের উপর ২০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২০০ গ্রাম টিএসপি সার ছিটিয়ে দেয়া ভালো। এতে পচন ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। সার ছিটানোর পর স্তরের উপর ২.৫-৫.০ সেমি পুরু করে গোবর এবং কাদা মাটির একটি প্রলেপ দিতে হবে। এর ফলে স্তরের ভিতর জীবাণুর ক্রিয়া বেড়ে যাবে এবং দ্রুত পচন কাজ সম্পন্ন হবে। এভাবে ১.২৫ মিটার উঁচু না হওয়া পর্যন্ত বারবার ১৫ সেমি পুরু করে শুকনো কচুরিপানা, আবর্জনা, খড়কুটো দিয়ে স্তর সাজাতে হবে এবং ২.৫-৫.০ সেমি পুরু করে গোবর ও কাদা মাটি দিয়ে লেপে দিতে হবে। গাদা তৈরি শেষ হলে এর উপরিভাগ মাটি দিয়ে লেপে দিতে হবে এবং সম্ভব হলে কম্পোষ্ট স্তুপের ওপর ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাদা পরীক্ষা

স্তুপ বা গাদা তৈরির কাজ শেষ হবার এক সপ্তাহ পর একটি শক্ত কাঠি গাদার মাঝখানে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে হবে যে, ভিতরের স্তরগুলো অতিরিক্ত ভেজা কিনা। যদি ভেজা থাকে, তাহলে শক্ত কাঠি দিয়ে গাদার উপর থেকে মাঝে মাঝে ছিদ্র করে দিতে হবে, যাতে বাতাস ঢুকতে পারে। এভাবে ভিতরের অংশ শুকিয়ে গেলে ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। আবার যদি অতিরিক্ত শুকিয়ে যায়, তাহলে ছিদ্র পথে পানি বা গো-চানা ঢেলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। তাড়াতাড়ি পচানোর জন্য কম্পোষ্ট তৈরির এক মাস পর প্রথম দুবার এবং দু'মাস পর দ্বিতীয় বার স্তরগুলো উল্টে পাল্টে দিলে ভাল হয়।



চিত্র ঃ কম্পোষ্ট চালায় সবজি চাষ

ব্যবহার
পর্যাপ্ত পরিমাণে গোবর, গো-চানা এবং ইউরিয়া ব্যবহার করা হলে স্তুপ তৈরির প্রায় ৩ মাসের মধ্যে কম্পোষ্ট জমিতে ব্যবহারের উপযুক্ত হবে। আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিলে যদি কম্পোষ্ট গুঁড়ো হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে জমিতে ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে।

খ) গর্ত পদ্ধতি
শুকনো মৌসুমে অথবা যেসব এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম, সেসব এলাকায় গর্ত পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট তৈরি করা উত্তম।

স্থান নির্বাচন
গো-শালার কাছে বা বাড়ির পেছনে অথবা অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে এ পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট তৈরি করা যাবে। রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গর্তের উপরে চালা দেয়া প্রয়োজন।

গর্তের আকার
সুবিধাজনক যে কোনো দৈর্ঘ্য বেছে নেয়া যেতে পারে। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১.২৫ মিটার এবং গভীরতা ১ মিটার হলে ভাল হয়। পাশাপাশি ২টি গর্ত করে মাঝে ১ ফুট চওড়া দেয়াল (পার্টিশন) রাখতে হবে।

তৈরির নিয়ম
গর্ত তৈরির পর ১ম গর্তের তলায় কিছু শুকনো খড়, কাঁকর ও বালি মিশিয়ে মুগুর দিয়ে পিটিয়ে নিতে হবে। তারপর কিছু শুকনো খড় বিছিয়ে একটি স্তর তৈরি করতে হবে। এটি জলীয় পদার্থ শোষণকারী স্তর হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এরপর গোয়ালঘর থেকে প্রতিদিনের সংগৃহীত গোবর, গবাদিপশুর খাবারের উচ্ছিষ্ট, ধান, গম, পাট, আখ বা যে কোন ফসলের অবশিষ্টাংশ অথবা গৃহস্থালীর যে কোন আবর্জনা গর্তে নিয়মিত ফেলতে হবে। এসব ফেলার পর একটি স্তর হয়ে গেলে এর উপরে গো-চানার সাথে কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে একটি প্রলেপ দিতে হবে। তারপর একইভাবে গোবর, গবাদিপশুর খাবারের উচ্ছিষ্ট ও অন্যান্য আবর্জনা ফেলে স্তর সাজাতে হবে। এভাবে স্তরের উপর স্তর সাজিয়ে পর্যায়ক্রমে গর্ত ভরাট করতে হবে। তবে আনুমানিক এক টন কম্পোষ্টের সাথে এক/দুই কেজি ইউরিয়া সার মিশাতে পারলে পচন ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং উৎপাদিত জৈব সারের মানও ভাল হয়।

প্রথম গর্ত ভরাট হয়ে আবর্জনার স্তর মাটি থেকে ৪৫ সেমি উঁচু হলে তার উপর গোবরগোলা দিয়ে মাটির প্রলেপ দিতে হবে। তাছাড়া মাঝে মাঝে পানি ছিটিয়ে দিলে জৈব পদার্থে পানির পরিমাণ সঠিক মাত্রায় থাকবে। ১ম গর্ত ভরাট হয়ে যাবার পর একই পদ্ধতিতে ২য় গর্তে আবর্জনা ফেলে পর্যায়ক্রমে ভরাট করতে হবে। ২য় গর্তের আবর্জনার স্তর ভরাট হলে ১ম গর্তের অনুরূপ গোবরগোলা দিয়ে মাটির প্রলেপ দিতে হবে। গর্ত পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট সার তৈরিতে তুলনামূলক সময় কম লাগে। সাধারণতঃ এ পদ্ধতিতে মাত্র দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যেই কম্পোস্ট বা আবর্জনা পচা সার জমিতে ব্যবহারের উপযোগী হয়।

সারনী-১ঃ কম্পোষ্ট সারে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমপি-র পরিমাণ

কম্পোস্ট	(কেজি) ইউরিয়া	(কেজি) টিএসপি (কেজি)	মিউরেট অব পটাশ (কেজি)
৪০	০.৩৪	০.২৭	০.৪৬
১০০	০.৮৫	০.৬৭	১.১৭
২৫০	২.১২	১.৬৮	২.৯৩
৫০০	৪.২৪	৩.৩৬	৫.৮৭
৭৫০	৬.৩৬	৫.০৪	৮.৮১
১০০০	৮.৪৮	৬.৭২	১১.৭৪

কম্পোস্ট সার তৈরির আয় ও ব্যয়
উৎপাদন ব্যয় ঃ চালা তৈরি বাবদ প্রাথমিক ব্যয় ৫০০.০০ টাকা (এ ছাড়া কোন খরচ নেই)।
আয় ঃ দৈর্ঘ্য ১.২৫ মিটার ও ১.২৫ মিটার প্রস্থ এবং ১ মিটার গভীরতা একটি গর্ত থেকে প্রতি দুই মাসে ৫০০ কেজি কম্পোষ্ট বা আবর্জনা পচা সার পাওয়া যায়।
প্রতি কেজি ৫.০০ টাকা হিসেবে মোট বিক্রয় ২৫০০.০০ টাকা।

মাশরুম চাষ

মাশরুমের পরিচিতি

মাশরুম বহুবিধ ঔষধী গুন সম্পন্ন ছত্রাক গোত্রের এক ধরনের উৎকৃষ্ট সবজি। বিশ্বে কয়েক হাজার জাতির মাশরুম বিদ্যমান। এর মধ্যে থেকে পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে খাওয়ার উপযোগী মাশরুমকে বিজ্ঞানীরা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে এসেছেন। চাষাবাদ যোগ্য ছত্রাক গোত্রের সবজিই হল মাশরুম। মাশরুম সারা বিশ্বে জনপ্রিয়, পুষ্টিকর, সুস্বাদু খাবার।



চিত্র ঃ মাশরুম

মাশরুম খাবার উপযোগী অত্যান্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। বিশ্বের সকল দেশেই মাশরুমের ব্যবহার হয়। তবে উৎপাদনের দিক থেকে জাপান, চীন, ভুটান, ভারত সহ অনেক দেশই এগিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশেও বর্তমানে প্রতি মাসে ৩/৪ টন মাশরুম উৎপন্ন হচ্ছে যা দেশের চাহিদা পুরণ করে বিশ্ব বাজারে রপ্তানির প্রচেষ্ট চলছে। চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, তারকা হোটেল সহ দেশের অভিজাত এলাকায়ই বর্তমানে মাশরুমের চাহিদা বেশি।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে সমস্ত মাশরুম চাষ করা হয় ঃ

ক) দুধ ছাতু (Milky White Mushroom) (খ) ঝিনুক মাশরুম (Oyster Mushroom) (গ) খড় মাশরুম (Straw Mushroom) (ঘ) শিতাকে মাশরুম (Shiitake Mushroom) (ঙ) বুতাম মাশরুম (Button Mushroom) এবং (চ) ঋষি মাশরুম (Reishi Mushroom)

মিলকি হোয়াইট মাশরুম

এই জাতের মাশরুম উৎপাদনের জন্য ৩০°-৩৫° সেলসিয়াস তাপ মাত্রার প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম কালে এই মাশরুম উৎপাদনের উপযুক্ত সময়।

উপাদান

ধানের খড়, গমের ভূষী, তুস, চুন, পানি, বালু, মাটি ও পলিথিন ইত্যাদি। এই মাশরুম প্রস্তুত প্রনালী ব্যবস্থা একটু আলাদা। গবেষণাগার থেকে বীজ বের করার পর স্পনের উপরি ভাগের পলিথিন অপসারণ করে ৫০ ভাগ মাটি এবং ৫০ ভাগ বালু মিশ্রণ করে জীবানু মুক্ত করে প্যাকটের উপরি ভাগে ২-৫ সেমি পরিমান প্রলেপ দিতে হবে। প্রলেপের পর উক্ত প্যাকেটে গুলো ৩০°-৩৫° তাপ মাত্রায় চাষ ঘরে সারিবদ্ধ ভাবে সাজিয়ে রেখে প্রতিদিন ৩/৪ বার কুয়াসার মত পানি স্প্রে করতে হবে। ৮/১০ দিন পরে উক্ত প্রলেপ ভেদ করে গোলাকৃতি মাশরুম বেড়িয়ে আসতে দেখা যাবে। ২/৩ দিনের মধ্যে মাশরুম তুলার উপযোগী হবে। প্যাকেট থেকে মাশরুম তুলে প্যাকেট গুলো আবার সারিবদ্ধ করে রেখে পানি স্প্রে করলে ১০/১২ দিন পরে আবার উক্ত প্যাকেটে মাশরুম উৎপাদন হবে। এভাবে ১ কেজির কম্পোষ্ট থেকে মোট ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম মাশরুম পাওয়া যাবে। এই জাতের মাশরুম খেতে খুবই সুস্বাদু।





চিত্র ঃ মিলকি হোয়াইট মাশরুম

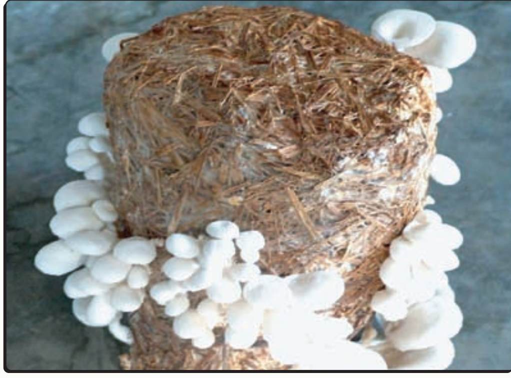
স্ট্র মাশরুম (উপাদান)

শুকনো ধানের খড়, স্পন বীজ, শিমুল তুলা, গম বা চালের কুড়া, খড় ভেজানোর পাত্র পলিথিন সিট ইত্যাদি।

পদ্ধতি

পরিমান মত শুকনো খড় পরিস্কার পানিতে ৬-১২ ঘন্টা ভিজাতে হবে। উক্ত পানির ১ ভাগ চুন পানির সাথে খড় ভেজানোর আগেই মিশিয়ে নিতে হবে। অতপর খড়গুলো পানি থেকে উঠিয়ে একটু উঁচু স্থানে রেখে ভাল ভাবে পানি ঝড়াতে হবে। সম্পুর্ণ পানি ঝড়ে গেলে খড়গুলো এক স্থানে পলিথিন এর উপড়ে রেখে অন্য একটি পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এভাবে ২-৩ দিন খড় গুলো ঢেকে রাখতে হবে। এই সময় খড়ের গাদায় সূর্যের আলো থাকে ভাল। অতপর খড়গুলো চাষ ঘরে নিয়ে এসে বেড তৈরি করতে হবে। প্রতিটি বেডের জন্য ১৫ কেজি শুকনো খড় দিয়ে বেড তৈরি করতে হবে। একটি তলা এবং ঢাকনা বিহীন কাঠের বাক্স নিয়ে উচ্চতা ৪০ সেমি লম্বা ৯০ সেমি এবং ৩০ সেঃমিঃ নীচে প্রথমে পলিথিন বিছিয়ে নিতে হবে। উক্ত ভেজা খড় থেকে ৫ কেজি পরিমানে বাক্সের মধ্যে চেপে চেপে বসাতে হবে। এরপর খড়ের উপরে প্রথমে ৬০ ভাগ পানি যুক্ত শিমুল তুলা বিছিয়ে দিতে হবে। তুলার উপরে ১০০ গ্রাম পরিমান গমের ভুষি ছিটিয়ে দিয়ে তার উপরে স্ট্র মাশরুমের স্পন বা বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে। পুনরায় ৫ কেজি পরিমান খড় দিয়ে পূর্বের ন্যায় শিমুল তুলা, গমের ভুসি ও স্পন বা বীজ ১০০ গ্রাম পরিমান দিয়ে আরেকটি স্তর তৈরি করতে হবে। অনুরূপ ভাবে আরো একটি স্তর করে তার উপর ২.৫ সেমি পরিমান খড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে ১০০ গ্রাম পরিমান পাউডার চুন ছিটিয়ে দিয়ে বেডের কাজ শেষ করতে হবে। এভাবে ৬০ সেমি দুরত্বে সারিবদ্ধ ভাবে পরিমান মত বেড করা যাবে। প্রতিটি বেডের জন্য ২৫০ গ্রামের একটি স্পনই যথেষ্ট। বেড সম্পন্ন করা হলে সবগুলো বেডের উপরে পলিথিন শীট দিয়ে ভালভাবে ঢেকে দিতে হবে। এসময় ঘরের তাপমাত্রা ৩০°-৩৫° সেলসিয়াস থাকা প্রয়োজন। দু'একদিন পর পর বেডের উপর থেকে পলিথিন সরিয়ে এর মধ্যে জমা থাকা পানি খুব সাবধানে অপসারণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই বেড থেকে আসা পানি যেন বেডের গায়ে না পরে। ৭-৮ দিন পরে বেডের শরীরে ছোট ছোট মাশরুম দেখা যাবে। এ সময়ে বেডের শরীর থেকে পলিথিন সরিয়ে মশারি মত করে দিতে হবে।

অর্থাৎ বেড থেকে অন্ততঃ ৩০/৬০ সেমি উচুঁতে পলিথিন ঝুলিয়ে দিতে হবে। এই সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ২৪/৪৮ ঘন্টার মধ্যে ছোট মাশরুম গুলো কবুতরের ডিমের মত আকার ধারণ করবে। অতপর মাশরুমগুলো খুব সাবধানে বেড থেকে তুলে বাজারজাত করা যাবে। সম্পুর্ণ ঘরে জীবাণু নাশক স্প্রে করে দিতে হবে। এভাবে একটি বেড থেকে ৪/৫ বার মাশরুম সংগ্রহ করা যাবে। অবিক্রীত মাশরুম লবণে রেখে সংরক্ষণ করা যাবে। এই উৎপাদন কলাকৌশল একটু কঠিন হলেও বাজার দাম ভাল। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এই মাশরুম উৎপাদন করা যায়। তবে যারা ১২ মাসেই এই মাশরুম উৎপাদন করতে চান তারা চাষ ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এই মাশরুম চাষ করতে পারেন।




চিত্র ঃ ষ্ট্র মাশরুম

আন্তঃ পরিচর্যা

- মাশরুম ঘরের চারপাশ সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যেহেতু মাশরুম একটি স্পর্শকাতর ছত্রাক জাতীয় সবজি।
- চাষ ঘরে সকাল বিকাল পরিমাণমত পানি স্প্রে করতে হবে।
- ঘরের মধ্যে পরিস্কার কাপড় পরিধান করে ঢুকতে হবে।
- মাশরুমের সারি থেকে সারির মধ্যে স্পন প্যাকেটের একটি অন্যটির গায়ের সাথে লাগানো যাবে না।
- মাশরুমের আকার সুন্দর করতে অতিরিক্ত অংকুর ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে প্রুনিং করে দিতে হবে।
- মাশরুমের শিরাগুলো ঢিলা হওয়ার পূর্বেই গায়ে পানি স্প্রে করা যাবে না।
- গরমের দিনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে স্প্রে মেশিন দিয়ে বৃষ্টির মত ঘরের দেয়াল এবং মেঝে কয়েকবার ভিজিয়ে দিতে হবে। তখন সম্ভব হলে এ সময় ফ্যান ছেড়ে দিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে ফ্যান বেশি সময় ব্যবহার করলে স্পন অথবা মাশরুম বেশি শুকিয়ে যাবে। সুতরাং মাশরুম সংগ্রহের পর পরই পানি স্প্রে করতে হবে।
- মাশরুমে সাধারণত কোন রোগবালাই নেই, কিংবা পোকা মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয় না। তবে কখনও মাছি, তেলাপোকা বা ইঁদুর মাশরুমের ক্ষতি করতে পারে। এ অবস্থা থেকে রেহাই পেতে চাষ ঘরের চার পাশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরী। এ ক্ষেত্রে মাশরুম ঘরের নিচ দিয়ে নেট ব্যবহার করে এবং ঘরের চারপাশে ব্লিচিং পাউডার, কীটনাশক এবং ইঁদুর নাশক ঔষধ ব্যবহার করে এ ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অনেক সময় মাশরুমের অংকুর সবুজ অথবা হলুদ হয়ে মারা যেতে পারে। এ অবস্থা দেখা মাত্রই প্যাকেটগুলো সরিয়ে ফেলে বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

সাবধানতা ঃ যে স্থানে মাশরুম চাষ করা হবে সেখানে যেন সূর্যের আলো প্রবেশ না করে।

ফলন (প্রতি ১০ প্যাকেট) ঃ ওয়েস্টার ২.৫ কেজি, মিলকি ৩ কেজি, ষ্ট্র ২ কেজি বেড প্রতি ১৫ কেজি শুকনো খড়।

সারনী - ১ ঃ মাশরুম চাষের আয়-ব্যায়ের বিবরণী

ওয়েস্টার (ফলন ২.৫ কেজি)	মিলকি (ফলন ৩ কেজি)	ষ্ট্র (ফলন ২ কেজি)
আয় ৪২৫.০০ টাকা	আয় ৪৫০.০০ টাকা	আয় ৬০০.০০ টাকা
ব্যয় ১২০.০০ টাকা	ব্যয় ১২০.০০ টাকা	ব্যয় ২০০.০০ টাকা
নীট মুনাফা ৩০০.০০ টাকা	**নীট মুনাফা ৩২৫.০০ টাকা**	**নীট মুনাফা ৪০০.০০ টাকা**

মাশরুম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

- মাশরুম যদি অধিক সময় রেখে বাজারজাতকরণ করতে হয় তবে মাশরুম ছোট অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে।
- মাশরুমগুলির কিনারা ফেটে যাওয়ার পূর্বে অথবা পিছনের শিরাগুলি ঢিলা হওয়ার পূর্বে উত্তোলন করে ফেলতে হবে।
- সঠিক ভাবে সংরক্ষণের জন্য মাশরুম উত্তোলনের পূর্বের দিন থেকে পানি দেয়া বন্ধ রাখতে হবে।
- মাশরুমের গোড়ায় শক্ত অংশ ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে টেবিলের উপর আধা থেকে ১ ঘন্টা ফ্যানের বাতাসের নিচে রাখতে হবে।
- ঠান্ডা বায়ুশূন্য অবস্থায় রাখা।
- হিমায়িত (ফ্রিজের সাধারণ তাপমাত্রায়) করে রাখা।
- শুকিয়ে রাখা।
- ১৮ থেকে ২০ ভাগ লবণে ৬ মাস পর্যন্ত রাখা যায়।

মাশরুম শুকানোর পদ্ধতি

মাশরুম সূর্যের আলোতে শুকিয়ে পলিথিন ব্যাগে সিল করে ৫-৬ মাস রাখা যায়। শুকনা ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হয়। ১৮-২০ ভাগ লবণের দ্রবণে মাশরুম ৬ মাস রাখা যায়। তাজা মাশরুমে ৭০-৯৫ ভাগ আদ্রতা থাকে এবং শুকনো মাশরুমে ১০-১২ ভাগ। প্রথম রৌদ্রে সারাদিন (২ দিন ব্যাপি) মাশরুম শুকিয়ে নিতে হবে। এক কেজি তাজা মাশরুম থেকে ১০০-১২০ গ্রাম শুকনো মাশরুম পাওয়া যাবে।



চিত্র ঃ মাশরুম দিয়ে তৈরি নানা ধরনের খাবার

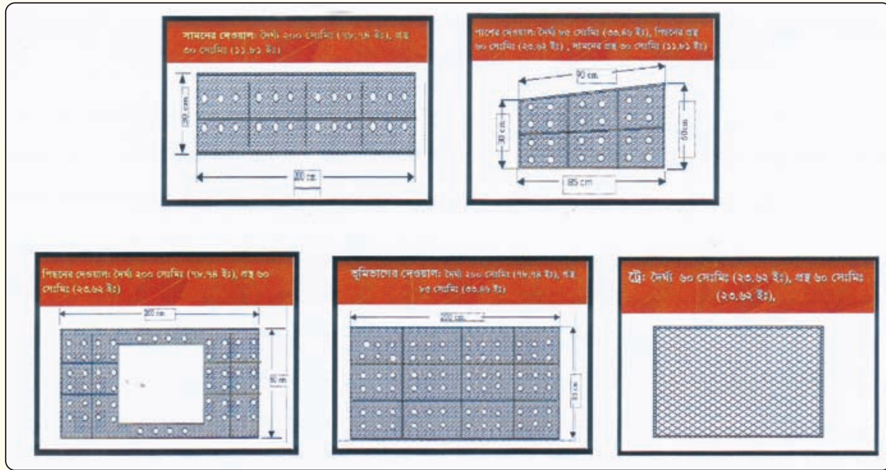
সৌর ড্রায়ার ও খাদ্য সংরক্ষণ

সৌর ড্রায়ার হচ্ছে শুকানোর এক ধরণের যন্ত্র। এটা সৌর শক্তি দ্বারা পরিচালিত। এটি দেখতে চারপায়া যুক্ত একটি বাক্সের মত, যার উপর স্বচ্ছ পলিথিনের আবরণ থাকে। সূর্যালোক থেকে বেশি পরিমাণ তাপ সংগ্রহ করে সৌর ড্রায়ারের ভিতরের বাতাসকে গরম করা হয় এবং সেই অধিক গরম বাতাস খাদ্যদ্রব্য শুকানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রকার ফলমূল ও শাকসবজি প্রক্রিয়াজাত করে এর ভিতরে রেখে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়।

বাংলাদেশে বিভিন্ন মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল ও শাকসবজি উৎপন্ন হয়। ফলমূল ও শাকসবজি দ্রুত পচনশীল কৃষিজাত দ্রব্য। প্রতি বছর এদেশে উৎপাদন ফলমূল ও শাকসবজির প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিভিন্ন কারণে পচে নষ্ট হয়। সংরক্ষণের মাধ্যমে এ অপচয়ের আংশিক রোধ করা সম্ভব। সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সৌর তাপে শুকিয়ে ফলমূল ও শাকসবজি সংরক্ষণ একটি সহজ পদ্ধতি। সৌর তাপে শুকানো বলতে সৌর ড্রায়ারের মধ্যেমে শুকানোকে বুঝায়। আমাদের দেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে রোদে খোলা অবস্থায় কাঁচা আম, কুল, আমসত্ব, মরিচ ইত্যাদি শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। খোলা রোদে শুকানো পদ্ধতিটি ত্রুটিপূর্ণ এবং শুকানো খাদ্যদ্রব্য দূষিত হতে পারে।

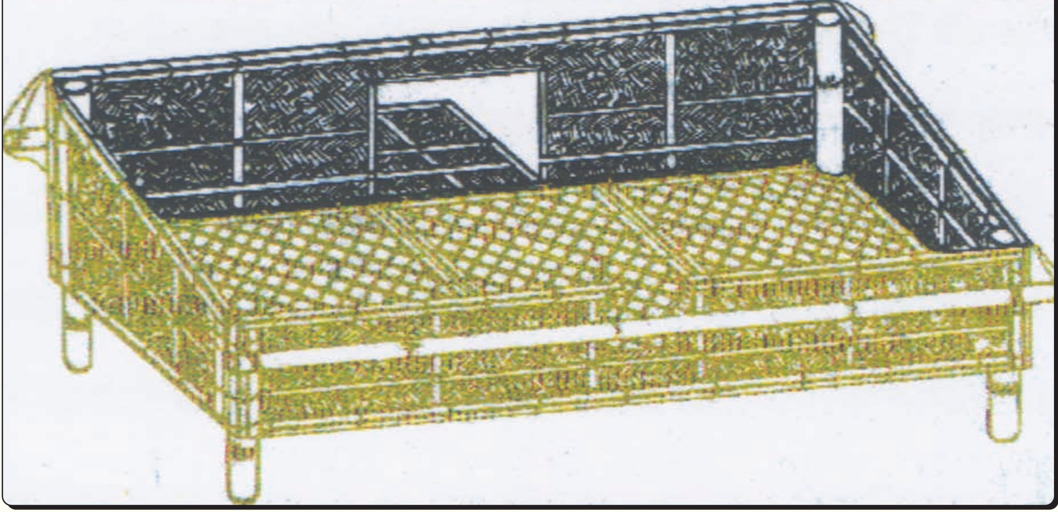
প্রস্তুত প্রণালী

মাপ অনুযায়ী বাঁশ ও বাঁশের ফালি কেটে ড্রায়ারের কাঠামো তৈরি করতে হবে (চিত্র-১, অনুযায়ী)। বাঁশের তৈরি একটি সৌর ড্রায়ারের বিভিন্ন অংশ কাঠামো-দৈর্ঘ্য ২০০ সেমি, প্রস্থ ৮৫ সেমি, পিছনের উচ্চতা ৮১ সেমি এবং সামনের উচ্চতা ৫১ সেমি।



চিত্র ঃ ড্রায়ারের বিভিন্ন অংশের সংযোজন

উপরে বর্ণিত কাঠামো ও দেওয়ালগুলি তৈরির পর ভূমি হতে ২১ সেমি উপরে ভূমিভাগের দেওয়ালটি ভূমির সমান্তরালে এবং অন্যান্য দেওয়ালগুলি খাড়াভাবে কাঠামোর সাথে তার দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। ভূমিভাগের দেওয়ালের ১০ সেমি উপরে বাঁশের ফালির একটা পাটাতন তৈরি করে তার উপর ট্রে ৩টি রাখতে হবে। ২টি নলী বাঁশের সাহায্যে স্বচ্ছ পলিথিনটি বাঁশের ফালির তৈরি একটি ফ্রেমের মধ্যে আটকিয়ে ও ড্রায়ারের উপরের খোলা অংশে সংযোজন করা যায়। দেয়াল গুলির ভিতরের অংশ কাল রং করতে হবে। কারণ কাল রং সূর্যালোক থেকে বেশি পরিমাণ তাপ শোষণ করে। ফলে ড্রায়ারের ভিতরের তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।



চিত্র ঃ ড্রায়ারের ভিতরের দেওয়ালে কালো রং কর

শুকানোর পূর্বে ফলমূল ও শাকসবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ

বাছাইকরণ ঃ প্রথমেই কাঁচামাল (ফলমূল ও শাকসবজি) বাছাই করতে হবে। পোকায় আক্রান্ত, ইঁদুরে আক্রান্ত, বর্ণহীন, দুর্গন্ধযুক্ত, কাটা বা ফাটা কাঁচামাল বাদ দিতে হবে। কাঁচামালগুলি তাজা ও ভাল হতে হবে। নতুবা ভাল শুস্ক খাদ্য সামগ্রী তৈরি করা যাবে না।

ধৌতকরণ ঃ বাছাই করা কাঁচামালগুলি পরিস্কার পানি দিয়ে ভালভাবে ধৌত করতে হবে। এই ধৌতকরণের ফলে কাঁচামালের গায়ে লেগে থাকা ধূলাবালি, পোকামাকড় ইত্যাদি দূরীভূত হবে।

খোসামুক্তকরণ ঃ খোসামুক্তকরণের সময় হাতে পড়তে লাগাতে হবে। তারপর ছুরি দিয়ে কাঁচামালগুলির খোসা মুক্ত করতে হবে। সকল শাকসবজি খোসা মুক্তকরণের প্রয়োজন হয় না। যেমন টমেটো শুধু বোঁটা, করলার দুই প্রান্ত, শাকের গোড়ার দিক, বাঁধাকপির গোড়ার দিক ও উপরের কিছু পাতা বাদ দিতে হবে। খোসামুক্ত কাঁচামালগুলিকে ৫% খাবার লবণের দ্রবণে ডুবিয়ে রাখতে হবে (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম লবণ মিশালে ৫% এর দ্রবণ হবে) কারণ খোলা বাতাসে রেখে দিলে অল্পক্ষণের মধ্যে খোসামুক্ত কাঁচামালগুলির রং কাল বা বাদামী বর্ণের হয়ে যায়।

টুকরাকরণ ঃ খোসামুক্ত করার পর কাঁচামালগুলি ১-২ মিমি সাইজে টুকরো করতে হবে। টুকরো করার পর টুকরোগুলিকে পূর্বের মত আবার লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

সিদ্ধকরণ ঃ লবণ পানি হতে টুকরো কাঁচামালগুলি উঠিয়ে ফুটন্ত পানিতে ফুটন্ত অবস্থায় সিদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধকাল শাকসবজি ও ফলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে যেমনঃ আলু ১৫ মিনিট, টমেটো ২ মিনিট, আনারস ৫ মিনিট সময় সিদ্ধ করার প্রয়োজন হয়। সবুজ শাকসবজি সিদ্ধ করার সময় ০.১% খাবার সোডা ফুটন্ত পানির সহিত যোগ করতে হবে (১ লিটার পানিতে ১ গ্রাম খাবার সোডা মিশালে ০.১% দ্রবণ হবে)। সিদ্ধ করার ফলে শুকাতে সময় কম লাগে, বিশুস্ক খাদ্যসামগ্রীর পূর্ণগঠন করা (আগের অবস্থায় আনা) সহজ হয়, সবজি বা ফলের স্বাভাবিক স্বাদ ও রং পরিবর্তনকারী এনজাইম ধবংস প্রাপ্ত হয়।

সালফাইটিংকরণ ঃ সিদ্ধ করা কাঁচামালগুলি সোডিয়াম মেটাবাই সালফাইটের ০.৫% দ্রবণে ১ ঘন্টাকাল ডুবিয়ে রেখে সালফাইটিং করা হয় (১ লিটার পানিতে এক চা চামচ সোডিয়ামমেটাবাই সালফাইট মিশালে ০.৫% এর দ্রবণ হবে)। সালফাইটিং করণের ফলে খাদ্য সামগ্রী বিশুস্ক হওয়ার সময় বা গুদামজাতকরণের সময় কাল বা বাদামী বর্ণের হয় না।

সৌর ড্রায়ারে ফলমূল ও শাকসবজি বিশুস্কীকরণ

ট্রেতে খাদ্য সজ্জিতকরণ- সালফাইটিংকৃত টুকরো কাঁচামালগুলি প্রতি ট্রেতে ১.৫-১.৭ কেজি হারে এক স্তরে সাজাতে হবে, যেন এ কটির উপর আরেকটি টুকুরো না পড়ে।

সৌর ড্রায়ারে বিশুস্কীকরণ খাদ্য দিয়ে সজ্জিত ট্রেগুলি ড্রায়ারের পিছনের দরজা দিয়ে ড্রায়ারের ভিতরে রাখতে হবে এবং ড্রায়ারটিকে সূর্যের দিকে মুখ করে দিতে হবে। প্রতিদিন ২ বার করে খাদ্য বস্তুগুলিকে উল্টিয়ে দিতে হবে। এইভাবে ২ থেকে ৪ দিনে খাদ্য বস্তগুলি নির্দিষ্ট আর্দ্রতায় শুকিয়ে যাবে। যখন বিশুস্ক খাদ্যসামগ্রী মচমচে ও খটখটে হবে, তখন বুঝতে হবে বিশুস্কীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বিশুস্ক শাকসবজির জলীয় অংশ ৫-৮% ও বিশুস্ক ফলের জলীয় অংশ ১০-১২% রাখতে হবে।

প্যাকেটজাতকরণ ঃ সৌর ড্রায়ারের শুকানো খাদ্য সামগ্রী একটি বড় টিনের বা প্লাষ্টিকের পাত্রের ভিতরে একটি বড় পলিথিন প্যাকেট রেখে তার মধ্যে রাখতে হবে। তারপর বড় পলিথিন প্যাকেটের মুখ বেঁধে ও পাত্রের মুখ ঢাকনা দ্বারা ঢেকে রাখলে শুকানো খাদ্যসামগ্রী দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকে। যেমনঃ শুকনো আলু ১ বছর, শুকনো গাজর ৬ মাস, শুকনো করলা ৬ মাস, শুকনো আনারস ৬ মাস, শুকনো টমেটো ৩-৪ মাস সংরক্ষিত থাকে।

সৌর ড্রায়ারের ও খাদ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তির বিশেষত্ব

সৌর ড্রায়ারে বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসবজি শুকাতে কোন জ্বালানি খরচ লাগে না। শুকনো ফলমূল ও শাকসবজি জীবাণুমুক্ত থাকে। শাকসবজি ও ফলমূলের অপচয় অনেকাংশে রোধ করা যায়। শুকনো সংরক্ষিত শাকসবজি ও ফলমূলের সাধারণ গুণাগুণ ও রং অক্ষুন্ন থাকে। সৌর তাপে সংরক্ষণ প্রযুক্তি অন্যান্য সংরক্ষণ প্রযুক্তির চেয়ে সহজ ও সস্তা। সৌর তাপে সংরক্ষণ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি যেমন খাবার লবণ, খাবার সোডা ও সোডিয়াম মেটাবাই সালফাইট (বি পি গ্রেড) দামে সস্তা।

শুকনো খাদ্যদ্রব্যের পুনর্গঠন ও রান্নার নিয়ম

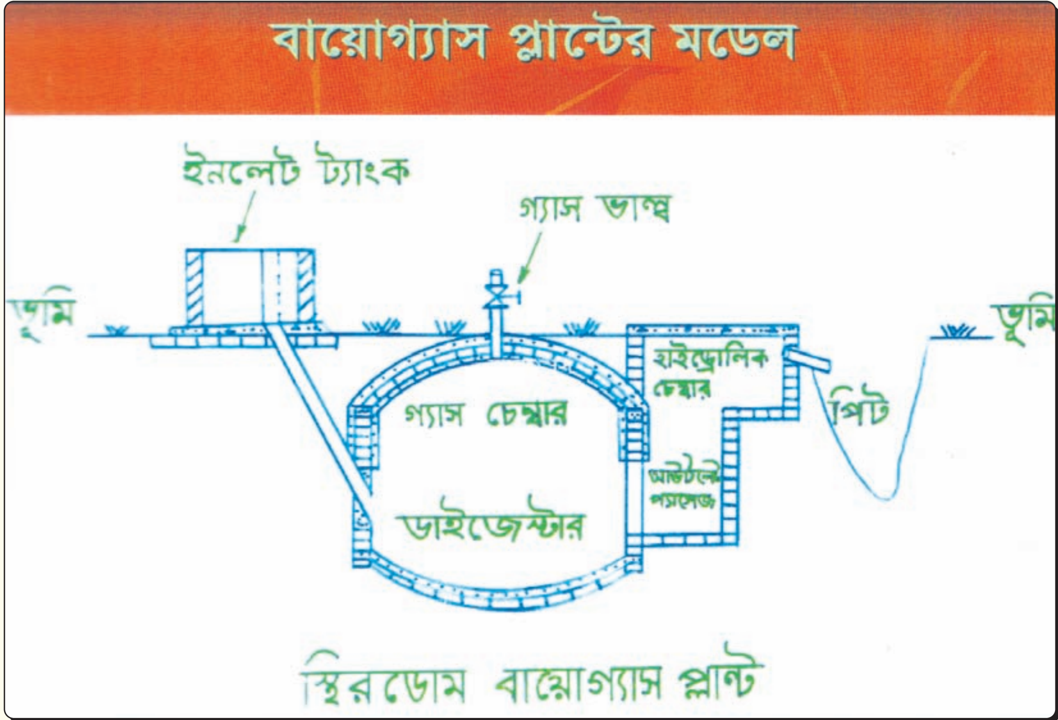
শুকনো ফল যেমন আনারস, আম, কলা সরাসরি খাওয়া যায়। শুকনো সবজি রান্নার পূর্বে ঠান্ডা পানিতে ১-২ ঘন্টা বা ফুটন্ত পানিতে ফুটন্ত অবস্থায় ১৫-২০ মিনিট রাখলে আগের অবস্থায় ফিরে আসে অর্থাৎ পূনর্গঠিত হয়। তারপর ইচ্ছামত রান্না করা যায়।

বায়োগ্যাস

যে কোন পঁচনশীল জৈব পদার্থ যেমন গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, মলমূত্র, আবর্জনা, কচুরীপানা, লতাপাতা, কৃষিজ বর্জ্য ইত্যাদি বাতাসের অনুপস্থিতিতে পঁচনের ফলে যে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাকেই বায়োগ্যাস বলা হয়। এতে ৬০-৭০ ভাগ মিথেন থাকে, বাকীটা মূলতঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড। গ্যাস উৎপাদনের পর যা অবশিষ্ট থাকে (বায়োগ্যাস রেসিডিউ) তা উন্নত মানের জৈব সার।

বায়োগ্যাস প্লান্ট

জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট গোবর, মুরগীর বিষ্ঠা ও অন্যান্য পচঁনশীল জৈব পদার্থ থেকে বায়োগ্যাস তৈরির প্ল্যান্ট উদ্ভাবন করেছে। স্থির ডোম মডেলের প্লান্টে আলাদা কোন গ্যাস হোল্ডার নেই। প্লান্টটি সম্পূর্ণ মাটির নিচে থাকে। কাজেই জায়গার কোন অপচয় হয় না। ইট, সিমেন্ট, বালু দিয়ে এই প্লান্ট তৈরি করা যায় এবং এর স্থায়িত্ব ৩০ বছরেরও অধিক এবং তৈরি খরচ একই আয়তনের ভাসমান ডোম মডেলের তুলনায় কম। উদ্ভাবিত স্থির ডোম মডেলের বায়োগ্যাস প্লান্ট বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।



বায়োগ্যাস প্রযুক্তির সুফল

বায়োগ্যাস প্রযুক্তি ব্যবহারের ৪টি সুফল পাওয়া যায় ঃ

- পরিচ্ছন্ন জ্বালানি গ্যাস।
- উন্নত মানের জৈব সার।
- দূষণমুক্ত পরিবেশ।
- স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ।

গ্যাস নির্গত হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা একটি উন্নত মানের জৈব সার। এই সারে জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সংরক্ষিত হয়, ফলে সারের মান উন্নত হয়। বায়োগ্যাস প্রযুক্তি জৈব চক্র সংরক্ষণে সহায়তা করে।

স্বাস্থ্যগত সুবিধাদি

বায়োগ্যাস প্রযুক্তির আর একটি বিশেষ দিক হল স্বাস্থ্যগত সুবিধা। আবর্জনাই হোক অথবা মানুষ বা পশু-পাখীর মল মুত্রই হোক, যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকলে দূর্গন্ধ ছড়ায়, মশা-মাছি আকৃষ্ট করে, রোগজীবাণু বিস্তারে সহায়তা করে। বায়োগ্যাস প্লান্টে এই সমস্ত দ্রব্য পঁচনের ফলে দূর্গন্ধ ছড়ায় না, মশা-মাছি আকৃষ্ট হয় না এবং রোগজীবাণু বহুলাংশে ধ্বংস হয়ে যায়।

বায়োগ্যাসের ব্যবহার

- তিতাস গ্যাসের মতই এই গ্যাস দিয়ে রান্না করা যায়।
- ম্যান্টেল জ্বেলে হ্যাজাক লাইটের মত আলো পাওয়া যায়।
- জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে লাইট, ফ্যান, রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিপি ইত্যাদি চালানো যায়।
- পাম্পের সাহায্যে জমিতে পানি সেচ করা যায়।
- এই গ্যাস ব্যবহার করে ফলমূল, খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করা যায় এবং এই গ্যাস দ্বারা ইনকিউবেটর চালানো যায়।

বায়োগ্যাস রেসিডিউ এর ব্যবহার

- উন্নত মানের জৈব সার।
- মাশরুম চাষ।
- কেঁচো চাষ।
- মুক্তা চাষ (হাঁস, মুরগী ও মাছের খাদ্য)।
- বীজ অংকুরোদগম।
- পশু খাদ্য এবং হাঁস-মুরগীর খাদ্য।

মাছ চাষ

পুকুরে মাছের খাদ্য এবং সার হিসেবে বায়োগ্যাস রেসিডিউ ব্যবহার করা যায়। বায়োগ্যাস সার প্লাংটন বিশেষ করে ফাইটোপ্লাংটন উৎপাদনের জন্যে খুবই উপযোগী যা মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং যা ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় প্রচুর অক্সিজেন অবমুক্ত করে। বায়োগ্যাস সারে অক্সিজেন চাহিদা কম থাকায় কাঁচা সারের তুলনায় বায়োগ্যাস সার প্রয়োগে পুকুরে ৪৩.৫০% দ্রবিভূত অক্সিজেন বেশি পাওয়া যায়। অবায়বীয় গাজন প্রক্রিয়ায় বায়োগ্যাস সারে পরজীবী ডিম্বানু এবং বায়ুজীবী প্যাথজেনিক ফ্যাঙ্গাস মারা যাওয়ার ফলে মাছের রোগ হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে।

বায়োগ্যাস সারের উৎকৃষ্টতা ও নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম পুষ্টিমান

পুষ্টি উপাদান সমূহের মধ্যে নাইট্রোজেনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়, কারণ নাইট্রোজেন গাছের পুষ্টি ও বর্দ্ধনের জন্য অপরিহার্য। প্লান্ট থেকে সদ্য বের হয়ে আসা সারে প্রাথমিক নাইট্রোজেন প্রায় ৯৯% সংরক্ষিত থাকে।

বায়োগ্যাস প্লান্টের তৈরী খরচ

৭-৮ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের দৈনিক রান্নাবান্না ও রাতে লাইট জ্বালানোর জন্য দিনে ৩ ঘন মিটার (১০৫ ঘনফুট) গ্যাস উৎপাদনক্ষম একটি স্থির ডোম প্লান্টের তৈরি খরচ (হ্যাজাক লাইট, বার্নার ইত্যাদি সহ) প্রায় ১৭,০০০.০০ টাকা। প্লান্টের সাথে জৈব সার সংরক্ষনের জন্য একটি পাকা বায়োফার্টিলাইজার পিট তৈরী করলে অতিরিক্ত আরও ৩,০০০.০০ টাকা ব্যয় হবে।

এই প্লান্টের জন্য দৈনিক প্রায় ৬০-৭০ কেজি গোবরের প্রয়োজন, যা ৫-৬ টি বড় গরু অথবা ৩-৪ টি মহিষ থেকে পাওয়া যায় অথবা দৈনিক ৩৫-৪০ কেজি হাঁস মুরগীর বিষ্ঠার প্রয়োজন যা ৩৫০-৪০০টি হাঁস মুরগী থেকে পাওয়া যায়। একই পরিমান গ্যাস উৎপাদনের জন্য দৈনিক ১০০ জন মানুষের মল-মূত্রের প্রয়োজন হয়।

উন্নত চুলা

কৃষি ভিত্তিক বাংলাদেশের বন সম্পদ রক্ষা ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে আমাদেরকে সকল জ্বালানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে গ্রামে গঞ্জে যে ধরণের চুলা ব্যবহৃত হয় তাতে জ্বালানির অহেতুক অপচয় হয়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, উক্ত চুলায় জ্বালানি পুড়িয়ে যতটুকু তাপশক্তি পাওয়া যায় তার সাধারণত শতকরা ৫ থেকে ১৫ ভাগ কাজে লাগে। আর বাকি শতকরা ৮৫-৯৫ ভাগ তাপশক্তির অপচয় ঘটে। অন্যদিকে এ চুলায় সৃষ্ট বিষাক্ত গরম গ্যাস ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে এবং পরিবেশকে দূষিত করে। জ্বালানির এ অহেতুক অপচয় রোধ এবং স্বাস্থ্যকর ও দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ এর জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ব্যবহারকারীর সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে পারিবারিক রান্না-বান্না কাজে ব্যবহারের জন্য উন্নত চুলা উদ্ভাবন করেছে। সাধারণ চুলার তুলনায় এ উন্নত চুলায় শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ জ্বালানি খরচ কম হয়। এ উন্নত চুলা সারা দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হলে এবং এতে কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ জ্বালানি বাঁচলেও ৫০ কোটি (এক কোটি নব্বই লক্ষ টন) মণেরও বেশি প্রচলিত জ্বালানি সাশ্রয় হবে। প্রতি মণ জ্বালানির গড় মূল্য ৫০.০০ টাকা হলেও এর ফলে দেশের বার্ষিক সাশ্রয় দাঁড়াবে দুই হাজার পাঁচশত কোটি টাকা।





চিত্র ঃ উন্নত চুলা

উন্নত দ্বিমুখী চিমনীযুক্ত চুলার সুবিধা

- তিন ভাগের দুই ভাগেরও বেশি লাকড়ি বেঁচে যায়।
- রান্না ঘরে ধোঁয়া ও কালি হয় না।
- ধোঁয়া চিমনীর সাহায্যে বাইরে বের হয়ে যায়।
- পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।
- গৃহিনীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে।
- রান্নাঘর গরম হয় না।
- হাড়ি পাতিল কম ময়লা হয়।
- কম সময়ে রান্না হয় এবং অগ্নি দুর্ঘটনা কম হয়।

উন্নত দ্বিমুখী চিমনীযুক্ত চুলা

- এই চুলা কেবল মাত্র কাঠ, ডাল-পালা, ঘুঁটে ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।
- এই চুলা ছোট ও মাঝারী পরিবারের জন্য খুবই উপযোগী।

পরিচিতি

- এই চুলায় কোন ঝিকা থাকে না। কাজেই পাতিল বসানোর পর পাতিল ও চুলার মাঝে কোন ফাঁক থাকে না। ফলে চুলা হতে সরাসরি কোন ধোঁয়া বা উত্তপ্ত গ্যাস বাইরে আসতে পারে না।
- এই চুলায় দুটি মুখ থাকে। প্রথম মুখে লাকড়ি জ্বলে এবং সরাসরি আগুনের তাপে রান্না হয়। এই মুখ হতে নির্গত গ্যাস ১২.৫ সেমি ব্যাসের একটি পথে দ্বিতীয় মুখে প্রবেশ করে এবং এই উত্তপ্ত গ্যাসেই দ্বিতীয় মুখে রান্না হয়। অবশেষে ব্যবহৃত গরম গ্যাস ও ধোঁয়া ৫ সেমি ব্যাসের একটি ছিদ্র পথ দিয়ে ৭.৫ সেমি ব্যাসের একটি চিমনীর সাহায্যে ঘরের বাইরে চলে যায়।
- প্রথম মুখটির ভিতরে ২০ সেমি নীচে একটি ছাকনী থাকে। এই ছাকনীর উপরে লাকড়ি পোড়ানো হয়। দ্বিতীয় মুখটির তলা এমনভাবে মাটি দিয়ে ভরাট করা হয় যেন পাতিল বসানোর পর পাতিলের তা থেকে দুরত্ব মাত্র ৫-৭ সেমি থাকে।
- প্রথম চুলার ছাকনীর নীচে জ্বালানি মুখের দুই পাশে বাতাস প্রবেশ ও ছাই বের করার জন্য (১২.৫ × ১২.৫ সেমি) দুটি মুখ থাকে।

তৈরির নিয়মাবলী

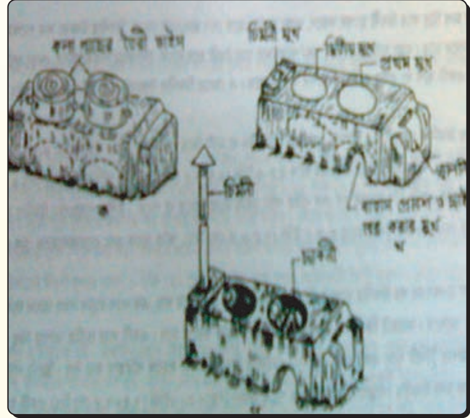
একটি দ্বিমুখী চিমনী চুলা তৈরির জন্য দুইটি ডাইস এমন ভাবে স্থাপন করুন যেন এদের মধ্যে অন্তত ৭.৫ সেঃমিঃ ফাঁক থাকে। ডাইস দুইটির গা দেয়াল পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিন। এবার ডাইসের চারিদিকে মাটি লাগিয়ে ৩৫ সেমি উঁচু করে চুলার কাঠামো তৈরি করুন। কাঠামোটি তৈরি করার সময় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দ্বিতীয় মুখের শেষ প্রান্তটি ১৫-১৭.৫ সেমি বাড়ানো থাকে, যাতে করে সেখানে ধোঁয়া বের হবার একটি চিমনী স্থাপন করা যায়।



চিত্র ঃ কলা গাছের তৈরি ডাইস

এবার ডাইস দুটি সরিয়ে নিন এবং দ্বিতীয় মুখটি মাটি দিয়ে ২৭.৫ সেমি পর্যন্ত ভরাট করে দিন। যে সমস্ত স্থানে জ্বালানি মুখ, দুই চুলার সংযোগ মুখ, চিমনী সংস্থাপন স্থান তৈরি করবেন সে সমস্ত স্থানে বাঁশের ফালি ঢুকিয়ে দিন যাতে এই মুখগুলো কাটার পর ঐ স্থানগুলো ভেঙ্গে না যায়। এ অবস্থায় কাঠামোটি কিছুটা শক্ত হওয়ার জন্য ২-১ দিন রেখে দিন। এরপর সম মাপের দুইটি পাতিল চুলার মুখ দুইটিতে স্থাপন করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মুখগুলো কেটে ঠিক করে নিন যাতে পাতিল বসানোর পর চুলা ও পাতিলের মাঝখানে কোন ফাঁক না থাকে। প্রথম চুলা মুখের এক পাশে (দ্বিতীয় মুখের বিপরীত দিকে) লাকড়ি দেয়ার জন্য ১২.৫ × ১২.৫ সেমি একটি মুখ কেটে দিন।

লাকড়ি রাখার জন্য লাকড়ি মুখের বাইরের দিকটা মাটি দিয়ে উঁচু করে একটু বাড়িয়ে দিন। প্রথম চুলা মুখের উপর থেকে ২০ সেমি নীচে ছাকনী বসানোর একটি তাক তৈরি করুন। বাতাস প্রবেশ এবং ছাই বের করার জন্য ছাকনীর নীচে লাকড়ি মুখের দুই পাশে ১২.৫ × ১২.৫ সেমি দুটি মুখ কেটে নিন। প্রথম মুখ থেকে দ্বিতীয় মুখে উত্তপ্ত গ্যাস প্রবেশ করার জন্য ১২.৫ সেমি ব্যাসের একটি পথ কেটে নিন।



চিত্র ঃ চুলা তৈরির বিভিন্ন ধাপ

এই পথের ঠিক বিপরীতে ৫ সেমি ব্যাসের একটি ছিদ্র পথ তৈরি করুন। এ পথ দিয়ে ধোঁয়া ও উত্তপ্ত গ্যাস চিমনীতে প্রবেশ করবে। দ্বিতীয় মুখের তলাটি এমনভাবে প্রস্তুত করুন যাতে ছিদ্র পথ থেকে ছাকনী পর্যন্ত ক্রমশঃ ঢালু হয়ে আসে। ৫ সেমি ব্যাসের এই ছিদ্র পথটি চিমনীর সাথে যোগ করার জন্য ১০ সেমি লম্বা (বিশেষ ক্ষেত্রে এই লম্বা পথটি ৩০ সেমি পর্যন্ত করা যেতে পারে) পথ তৈরি করুন। এর শেষ প্রান্তে চিমনী বসানোর জন্য উঁচু করে চারকোণা বিশিষ্ট একটি চিমনী মুখ তৈরি করুন। এই চিমনী মুখের উপর পাশাপাশি দুইটি রডের টুকরা অথবা বাঁশের ফালি বসিয়ে দিন।

এই মুখের উপর ৫-৭ সেমি ব্যাসের উপযুক্ত উচ্চতার একটি চিমনী বসিয়ে চার পাশে মাটি দিয়ে ভালভাবে মুড়িয়ে দিন যেন মুখটির সাথে চিমনীটি শক্তভাবে লেগে থাকে। প্রয়োজনবোধে চিমনীটিকে সোজা রাখার জন্য একটি বাঁশ বা খুটি ব্যবহার করতে পারেন। মাটির সাথে কিছু গোবর/চালের কুড়া মিশিয়ে চুলাটিকে ভালভাবে লেপে শুকিয়ে ব্যবহার উপযোগী করে নিন।

চিমনী

চিমনীর প্রধান কাজ হলো- চুলার প্রথম মুখের সৃষ্ট গরম গ্যাসকে ২য়/৩য় মুখে টেনে আনে এবং সেখানে ব্যবহার করতে সাহায্য করা এবং পরিবেষে রান্না ঘরের বাইরে বের করে দেয়া। চিমনী সাধারণত রান্না ঘরে দুইভাবে স্থাপন করা যায়, যথাঃ (১) রান্না ঘরের ছাদ/চাল ফুটো করে চালের ভিতর দিয়া সোজা করে স্থাপন করা (২) রান্না ঘরের বেড়া ফুটো করে ঘরের বাহিরে এর পিড়ার উপর একটি বাঁশ/খুটির সাহায্যে সোজা করে স্থাপন করা।

ছাদ/চাল ছিদ্র করে চিমনী স্থাপন করলে, লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ছাদ/চাল থেকে চিমনীর উচ্চতা কম পক্ষে ৭৬ সেমি থাকতে হবে। রান্না ঘরের চাল যদি শন/পাতা/খড় দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে চিমনী ঘরের বেড়া ফুটো করে ঘরের পিড়ার উপর একটি বাঁশ বা খুটির সাহায্যে স্থাপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে চিমনীর উচ্চতা ৯০-১৫০ সেমি হবে।

কিছু দিন চুলা ব্যবহারের পর চিমনীর মধ্যে কালি জমে চিমনী পথটি ছোট হয়ে যায়, এর ফলে রান্নার সময় আগুন লাকড়ীর মুখ দিয়ে বাহিরে বের হয়ে আসবে। কাজেই কিছু দিন পর পর চিমনীটি পরিস্কার করতে হবে। একটি লম্বা কাঠির আগায় কিছু পুরাতন কাপড় পেটিয়ে চিমনীর আগার চিপিটি খুলে এর ভিতর এই কাঠি ঠোকিয়ে চিমনীটি অতি সহজে পরিস্কার করা যায়। চিমনী পরিস্কার করার পর সৃষ্ট কালি বের করার জন্য চিমনীর গোড়ায় ডান কিম্বা বাম পার্শ্বে অথবা পিছনে ৭.৫ × ৭.৫ সেমি একটি মুখ রাখতে হবে। চুলা ব্যবহারের সময় এই মুখটি অবশ্যই ঢাকনী দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

উন্নত চুলা ব্যবহারে
জ্বালানী সাশ্রয় করে

পাপড় তৈরি

বাংলাদেশের বিভিন্ন রকমের মুখরোচক খাবারের মধ্যে পাপড় অন্যতম। এটি অতি জনপ্রিয়, সহজপাচ্য ও সুস্বাদু মুখরোচক খাদ্য। পাপড় যেমন তেলে ভেজে খাওয়া যায়। তেমনি বিভিন্ন সবজি সুপ ও কারী সুপের সাথে খেতে ভাল লাগে। ইহা দেশের প্রায় অধিকাংশ জায়গাতেই সারা বছর পাওয়া যায়। ক্রুটিমুক্ত প্রক্রিয়াজতকরণ পদ্ধতি সঠিক প্রয়োগের অভাবে পাপড়ের পরিমাণগত ও গুণগতমানের অপচয় ঘটে। এটির প্রস্তুত পদ্ধতি অতি সহজ। দরিদ্র লোকজন এ সহজ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বহুলাংশে অপচয় রোধের পাশাপাশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। উন্নত মানের চাল ও ডালের মিহি গুঁড়া/ময়দা দিয়ে এটি তৈরি করা হয়।

পাপড় তৈরির পদ্ধতি

ভালমানের সমপরিমাণ মুগ ও মাসকলাই ডাল একসাথে মিশিয়ে মেশিনের মাধ্যমে ভেঙ্গে গুঁড়া করা হয়। এক কেজি পানি ফুটিয়ে নিয়ে ৮০ গ্রাম লবণ, ৫ গ্রাম জিরা, ৫ গ্রাম কালো জিরা, ৫ গ্রাম গোলমরিচের গুঁড়া, ৭০ গ্রাম দই, ১০ গ্রাম খাবার সোডা, ১ গ্রাম হিং ও ১ গ্রাম কাতেলী দিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা হয়। অতঃপর সমপরিমাণ মুগ ও মাসকলাই ডালের মিহি গুঁড়া/ময়দা নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মিশ্রিত ঠান্ডা পানি যোগ করে ৫-৮ মিনিট রোলিং করলে পাপড় তৈরির উপযুক্ত মন্ড তৈরি হয়। মন্ডটিকে লম্বালম্বি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে সুতা দিয়ে কেটে নেওয়া হয়। গোল আকৃতির মসৃণ কাঠের পিড়িতে বেলুন দিয়ে চাপ দিয়ে কয়েকবার এপিট ওপিঠ করলে পাপড় তৈরি হয়। পাপড়ের ব্যাস সাধারণত ১০-১৪ সেমি ও পুরুত্ব ০.৬-০.৯ মিমি আকৃতির হয়ে থাকে। এগুলো ২০-২৫ মিনিট রৌদ্রে শুকানোর পর ঠান্ডা হলে পলিপ্রোপাইলিন প্যাকেটে ভরে ভালভাবে মুখ সিল করে ৮-১০ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

আচার

আমের আচার

আমকে ফলের রাজা বলা হয়। এটা অত্যন্ত উপাদেয় একটি ফল। মৌসুমী ফল হওয়ায় মাত্র কয়েক মাস আম পাওয়া যায়। আবার আম ছোট থাকা অবস্থায় অনেক সময় ঝড়ে অধিকাংশ বা সমস্ত আম পড়ে যায়। ঝড়ে পড়া আম দিয়ে সুস্বাদু আচার তৈরি করে সারা বছর ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে অপচয় রোধ করে পারিবারিক আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালী

- আমের আচারের ভাল কাঁচা আম বেছে নিতে হবে। পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- আমগুলো লম্বালম্বিভাবে ৬-৮ ভাগ করে কেটে দনিতে হবে।
- এক কেজি আমের টুকরার সাথে ৪০ গ্রাম লবণ মাখিয়ে ১০-১৫ ঘন্টা রেখে দিতে হবে।
- অতঃপর টুকাগুলো উঠিয়ে ৫ গ্রাম হলুদ মিশিয়ে বাঁশের চালুনী বা ট্রেতে ৫-৬ ঘন্টা রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।
- ওজন করা টুকরাগুলো তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে।
- আদা এবং রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মিলিলিটার ১% অ্যাসেটিক এসিড দ্রবণ সহযোগে পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে।
- শুকনো মরিচের গুঁড়া আদা রসুনের পেস্টের সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটি আম ভেজে নেয়ার পর কড়াইয়ে অবশিষ্ট তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে।
- ভাজা চলাকালীন ভাজা আমের টুকরো, চিনি, মেথী, জিরার গুঁড়া ও সরিষার গুঁড়া একে একে যোগ্য করতে হবে। অবশেষে লবণ এবং অবশিষ্ট অ্যাসেটিক এসিড অর্থাৎ ১০ মিলিলিটার গ্লাসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড যোগ করে ভালভাবে মিশিয়ে কম তাপে ৩-৫ মিনিট জ্বাল দিতে হবে।
- অতঃপর চুলা থেকে নামানোর পর গরম অবস্থায় জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ছিপি এঁটে দিতে হবে।

সারণী-১ ঃ আমের আচার তৈরির উপকরণ

উপকরণ	পরিমান
আম	০১ কেজি
শুকনা মরিচের গুঁড়া	২০ গ্রাম
রসুন	৩০ গ্রাম
আদা	৬০ গ্রাম
হলুদের গুঁড়া	১০ গ্রাম
সরিষার গুঁড়া	২০ গ্রাম
চিনি	১০০ গ্রাম
মেথির গুঁড়া	০৫ গ্রাম
গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড	১১ মিলি
লবণ	৪০ গ্রাম
জিরা	০৩ গ্রাম
সরিষার তেল	৫০০ মিলি



চিত্র ঃ আমের আচার

জলপাই এর আচার

বাংলাদেশের সর্বত্রই জলপাই জন্মে থাকে। কাঁচা এবং পাকা উভয় অবস্থাতেই জলপাই খাওয়া যায়। জলপাইয়ে প্রচুর পুষ্টি উপাদান আছে। জলপাই এর আচার খুবই উপাদেয় এবং সহজেই তৈরি করা যায়। বাণিজ্যিকভাবে জলপাই আচার তৈরির মাধ্যমে আয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালী

- জলপাই এর জন্য ভাল জলপাই বেছে নিয়ে পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- জলপাইগুলো লম্বালম্বি ৩ ভাগ করে কেটে নিতে হবে।
- এক কেজি জলপাই টুকরার সাথে ৪০ গ্রাম লবণ মাখিয়ে ১০-১৫ ঘন্টা রেখে দিতে হবে।
- অতঃপর জলপাইগুলো উঠিয়ে ৫ গ্রাম হলুদ মিশিয়ে বাশের চালুনী বা ট্রেতে ২-৩ ঘন্টা রৌদে শুকাতে হবে।
- ওজন করা টুকরাগুলো তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে।
- আদা এবং রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মিলি লিটার ১% অ্যাসেটিক এসিড দ্রবণ সহযোগে পেস্ট তৈরি করতে হবে।
- শুকনো মরিচের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া আদা রসুনের পেস্টের সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটি জলপাই ভেজে নেয়ার পর অবশিষ্ট তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে।
- ভাজা চলাকালীন ভাজা জলপাই টুকরো, চিনি, মেথী, জিরার গুঁড়া ও সরিষার গুঁড়া একে একে যোগ করতে হবে। অবশেষে লবণ এবং অবশিষ্ট অ্যাসেটিক এসিড অর্থাৎ ১০ মিলি লিটার গ্লাসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড যোগ করে ভালভাবে মিশিয়ে কম তাপে ৩-৫ মিনিট জ্বাল দিতে হবে।
- অতঃপর চুলা থেকে নামানোর পর গরম অবস্থায় জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ছিপি এঁটে দিতে হবে।

সারণী-১ ঃ জলপাই এর আচার তৈরির উপকরণ

উপকরণ	পরিমান
জলপাই	০১ কেজি
শুকনা মরিচের গুঁড়া	২০ গ্রাম
রসুন	৩০ গ্রাম
আদা	৬০ গ্রাম
হলুদের গুঁড়া	১০ গ্রাম
সরিষার গুঁড়া	২০ গ্রাম
চিনি	১০০ গ্রাম
মেথির গুঁড়া	০৫ গ্রাম
গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড	১১ মিলি
লবণ	৪০ গ্রাম
জিরা	০৩ গ্রাম
সরিষার তেল	৫০০ মিলি



চিত্র ঃ জলপাই এর আচার

আমড়ার আচার

আমড়া বাংলাদেশের সর্বত্র সুপরিচিত ও সমাদৃত। আমড়া খেতে খুব সুস্বাদু। ভিটামিন-সি ছাড়াও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ এ ফলটি দিয়ে উন্নত মানের আচার ও চাটনী তৈরি করা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী

- আমড়ার আচার এর জন্য ভাল আমড়া বেছে নিয়ে পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে বটি বা চাকু দিয়ে আমড়ার উপরের ছাল বা ত্বক ছিলে ফেলে দিতে হবে।
- আমড়াগুলো লম্বালম্বি ৬-৮ ভাগ করে কেটে নিতে হবে।
- এক কেজি আমড়ার সাথে ৪০ গ্রাম লবণ মাখিয়ে ১০-১৫ ঘন্টা রেখে দিতে হবে।
- অতঃপর টুকুরোগুলো উঠিয়ে ৫ গ্রাম হলুদ মিশিয়ে বাঁশের চালুনী বা ট্রেতে ৪-৫ ঘন্টা রৌদ্রে শুকিয়ে নিতে হবে; ● ওজন করা টুকরাগুলো তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে।
- আদা এবং রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মিলিলিটার ১% অ্যাসেটিক এসিড দ্রবণ সহযোগে পেস্ট তৈরি করতে হবে।
- শুকনো মরিচের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া আদা রসুনের পেস্টের সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটি আমড়া ভেজে নেয়ার পর অবশিষ্ট তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে।
- ভাজা চলাকালীন ভাজা আমড়ার টুকরো, চিনি, মেথী, জিরার গুঁড়া ও সরিষার গুঁড়া একে একে যোগ করতে হবে। অবশেষে লবণ এবং অবশিষ্ট অ্যাসেটিক এসিড অর্থাৎ ১৪ মিলি লিটার গ্লাসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড যোগ করে ভালভাবে মিশিয়ে কম তাপে ৩-৫ মিনিট জ্বাল দিতে হবে।
- অতঃপর চুলা থেকে নামানোর পর গরম অবস্থায় জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ছিপি এঁটে দিতে হবে।

সারণী-১ ঃ আমড়ার আচার তৈরির উপকরণ

উপকরণ	পরিমান
আমড়া	০১ কেজি
শুকনা মরিচের গুঁড়া	২০ গ্রাম
রসুন	৩০ গ্রাম
আদা	৬০ গ্রাম
হলুদের গুঁড়া	১০ গ্রাম
সরিষার গুঁড়া	২০ গ্রাম
চিনি	১০০ গ্রাম
মেথির গুঁড়া	০৫ গ্রাম
গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড	১১ মিলি
লবণ	৪০ গ্রাম
জিরা	০৩ গ্রাম
সরিষার তেল	৫০০ মিলি



চিত্র ঃ আমড়ার আচার

বেগুনের আচার

বেগুন বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় সবজি। উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন এ সবজি সারা বছরই পাওয়া যায়। বেগুন থেকে উন্নত মানের আচার তৈরি করা যায়। বেগুনের আচার খুবই রুচিকর। সহজ পদ্ধতিতে মূল্যবান যন্ত্রপাতি ছাড়াই তা প্রস্তুত করা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী

- আচার এর জন্য সরু ও লম্বা বেগুন নিতে হবে। বেগুনের বোটা ফেলে দিয়ে পরিস্কার পানিতে ধুয়ে ১ কেজি পরিমাণ ওজন নিয়ে উপকরণের পরিমাণ অনুসারে অন্যান্য দ্রব্যের ওজন নিতে হবে।
- বেগুনগুলো ৫ সেঃমিঃ লম্বা টুকরা করে কেটে টুকুরোগুলো লম্বালম্বিভাবে মাঝ বরাবর কেটে দুইটি ফালি করে নিতে হবে।
- টুকরাগুলো তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে।
- আদা এবং রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মিলিলিটার ৪% অ্যাসেটিক এসিড দ্রবণ সহযোগে পেস্ট তৈরি করতে হবে। কাঁচা মরিচের বোঁটা ছাড়িয়ে ১০০ মিলিলিটার ৪% অ্যাসেটিক এসিড দ্রবণে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- শুকনো মরিচ ও হলুদের গুঁড়া আদা রসুনের পেস্টের সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটি বেগুন ভেজে নেয়ার পর কড়াই-এর বেগুন ভাজার অবশিষ্ট তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে।
- ভাজা চলাকালীন ভাজা বেগুনের টুকরো, কাঁচা মরিচ, চিনি, মেথী ও জিরার গুড়া একে একে যোগ করতে হবে। অবশেষে সরিষার গুঁড়া, লবণ এবং অবশিষ্ট অ্যাসেটিক এসিড অর্থাৎ ১০ মিলিলিটার গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড যোগ করতে হবে।
- মিশ্রণটি কাংখিত পর্যায়ে এলে জ্বাল দেয়া বন্ধ করতে হবে এবং জীবাণুমুক্ত বোতলে এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে আচারের উপরে তেলের স্তর থাকে। আচার ভর্তি বোতল শুস্ক ও ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হবে।

সারণী-১ ঃ বেগুনের আচার তৈরির উপকরণ

উপকরণ	পরিমান
বেগুন	০১ কেজি
শুকনা মরিচের গুঁড়া	২৫ গ্রাম
রসুন	৩০ গ্রাম
আদা	৬০ গ্রাম
হলুদের গুঁড়া	১০ গ্রাম
সরিষার গুঁড়া	১৫ গ্রাম
চিনি	২০০ গ্রাম
মেথির গুঁড়া	০৫ গ্রাম
গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড	১৫ মিলি
লবণ	৫০ গ্রাম
জিরা	২.৫ গ্রাম
সরিষার তেল	৪০০ মিলি


চিত্র ঃ বেগুনের আচার

রসুনের আচার

বাংলাদেশে রসুন একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিবর্ষজীবী শুস্ককন্দ জাতীয় মসলা ফসল। বাংলাদেশে এর চাষ সাধারণত রবি মৌসুমে সীমাবদ্ধ। শাক-সবজি, মাংস প্রভৃতি রান্নায় যেমন রসুন ব্যবহৃত হয় তেমনি আচার-চাটনি প্রস্তুতেও এর ব্যবহার কম নয়। খাদ্যে মসলা হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও এর অনেক ঔষধী গুণ রয়েছে। আয়ুর্বেদীয় মতে, রসুন ব্যবহারে শরীরের খোস-পাঁচড়া, অজীর্ণ, পেট ফাপা, পেটে বায়ু জমা, গুল বেদনা, হৃদরোগ, অর্শ্ব, সর্দি, কাশি, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, বাতরোগ ও যে কোন ধরনের চর্মরোগ নিবারণ করে। প্রতি ১০০ গ্রাম রসুনে ৬২.০ গ্রাম পানি, ২৮.৮ গ্রাম শ্বেতসার, ৬.৩ গ্রাম প্রোটিন, ০.১ গ্রাম তেল, ১.০ গ্রাম খনিজ পদার্থ, ০.৮ গ্রাম আঁশ এবং ভিটামিন সি থাকে। রসুনের তেলে সালফার জাতীয় পদার্থ আছে। তাছাড়া রসুন শরীরের উষ্ণতা এবং মুখের সৌন্দর্য বাড়ায়। এমনই গুণসম্পন্ন এই মসলার প্রক্রিয়াজাতকরণ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রস্তুত প্রণালী

- ত্রুটিমুক্ত বড় আকারের রসুন নিয়ে কোয়া আলাদা করে খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে।
- এবার কোষগুলো কড়াইয়ে নেয়া তেলে ভেজে আলাদা পাত্রে রাখতে হবে।
- আদা ও রসুন ১০০ সিসি ১% অ্যাসেটিক এসিডসহ বেঁটে বা ব্লেন্ডিং মেশিনে মন্ড তৈরি করে অপর একটি পাত্রে রাখতে হবে।
- অতঃপর সসপেনে অবশিষ্ট তেলে আদা, রসুনের মন্ড, স্বল্প ভাজা রসুনের কোয়া, চিনি, মরিচের গুঁড়া, সরিষার গুড়া, হলুদের গুঁড়া ও জিরার গুঁড়া ইত্যাদি একের পর এক সসপেনে ঢেলে কম তাপে ৩-৫ মিনিট জ্বাল দিতে হবে। শেষে লবণ এবং বাকি অ্যাসেটিক এসিড দিয়ে জ্বাল দিতে হবে।
- ঘন হয়ে এলে জ্বাল বন্ধ করে গরম অবস্থায় বোতলের মুখ এঁটে দিতে হবে।
- ঘরের শুস্ক এবং ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

সারণী-১ ঃ রসুনের আচার তৈরির উপকরণ

উপকরণ	পরিমান
রসুনের খোসামুক্ত কোষ	০১ কেজি
রসুন	৩০ গ্রাম
শুকনা মরিচের গুঁড়া	২০ গ্রাম
সরিষার গুঁড়া	২০ গ্রাম
মেথির গুঁড়া	০৫ গ্রাম
লবণ	৫০ গ্রাম
আদা	৬০ গ্রাম
চিনি	১০০ গ্রাম
হলুদের গুঁড়া	১০ গ্রাম
জিরা	০৩ গ্রাম
সরিষার তেল	৪০০ মিলি
গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড	১৫ মিলি



চিত্র ঃ রসুনের আচার

তেঁতুলের সস

তেঁতুল একটি জনপ্রিয় ভেষজ ফল যা মহিলাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য তেঁতুলে ১৭-৩৫ গ্রাম পানি, ২-৩ গ্রাম আমিষ, ০.৬ গ্রাম চর্বি, ৪১-৬১ গ্রাম শর্করা, ২.৯ গ্রাম আঁশ, ৩৪-৯৪ মিঃগ্রাঃ ক্যালশিয়াম, ৩৪-৭৮ মিঃগ্রাঃ ফসফরাস এবং ৪৪ মিঃগ্রাঃ ভিটামিন সি থাকে। পেটের বায়ু ও হাত-পা জ্বালায় তেঁতুলের শরবত উপকারী। তেঁতুলে টারটারিক এসিড থাকে যা হজমে সাহায্য করে। তেঁতুলের শরবত ব্যবহারে মাথা ব্যথা এবং ধুতুরা, কচু ও অ্যালকোহলের বিষাক্ততা নিরাময় হয়। তেঁতুল ব্যবহারে প্যারালাইসিস অঙ্গের অনুভূতি ফিরে আসে। তেঁতুলের সস উপাদেয় একটি খাবার। অতি সহজেই এটা তৈরি করা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী

- তেঁতুল (বীজ সহ) তার দ্বিগুণ পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে চটকিয়ে পাল্প/মন্ড তৈরি করতে হবে। দ্রুত করার জন্য গরম পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পাল্প তৈরি হলে চাকনী দিয়ে ছেকে বীজ থেকে পাল্প আলাদা করতে হবে।
- তেঁতুলের পাল্প এর সাথে চিনি ও লবণ মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে। এর সাথে মরিচ গুঁড়া মিশাতে হবে।
- মসলাগুলো ভেজে গুঁড়া করে নিয়ে পেঁয়াজ ও রসুন কুঁচি করে মসলার সাথে একত্রে পাতলা কাপড়ের পুটলিতে বেঁধে মিশ্রণে ছেড়ে দিতে হবে।
- জ্বাল চলাকালীন ঘন ঘন নাড়তে হবে এবং হাতা দিয়ে মাঝে মাঝে চেপে পুটলির রস সসের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
- ২০-২৫ মিনিট জ্বাল হলে এবং কাঙ্খিত ঘনত্বে এলে (টিসএস ৪৫০ ব্রিক্স হলে) সামান্য পানিতে সোডিয়াম বেনজয়েট গুলিয়ে সসের সাথে মিশাতে হবে।
- জীবাণুমুক্ত (গরম পানি ও সাবান দিয়ে ধুয়ে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে) বোতলে সস গরম অবস্থাতেই ঢেলে ফেলতে হবে। ছিপি ভালভাবে বন্ধ করার পর বোতলটি কাত করে রাখতে হবে। পরে কাপড় দিয়ে মুখে বোতলগুলি সোজ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

সারণী-১ ঃ তেঁতুলের সস তৈরির উপকরণ

উপকরণ	পরিমান
তেঁতুল পাল্প	০১ কেজি
চিনি	৩৫০ গ্রাম
লবণ	২.০ গ্রাম
পেঁয়াজ	৩০ গ্রাম
রসুন	৫০ গ্রাম
লবঙ্গ	২.০ গ্রাম
দারুচিনি	২.০ গ্রাম
গোল মরিচ	১.০ গ্রাম
এলাচ	১.০ গ্রাম
জিরা	১.০ গ্রাম
জৈত্রী	১.০ গ্রাম
শুকনা মরিচের গুঁড়া	০.১০ গ্রাম
সোডিয়াম বেনজয়েট	০.৭৫ গ্রাম



চিত্র ঃ তেঁতুলের সস

কুলের চাটনী

স্বাদ ও পুষ্টিমানের বিচারে কুল বাংলাদেশের একটি উৎকৃষ্ট ফল। বাংলাদেশের সব জেলাতেই কুলের চাষ হয়। বর্তমানে কুল চাষে মানুষ খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এর ফল এবং পাতা বাটা বাতের জন্য উপকারী। কুল রক্ত পরিস্কার ও হজমে সাহায্য করে। শুকনো কুলের গুঁড়া এবং আখের গুড় মিশিয়ে খেলে মেয়েদের সাদা স্রাবের উপকার হয়। কুল থেকে উৎকৃষ্ট মানের চাটনী তৈরি করা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী

- ভাল কুল বেছে নিয়ে বোটা ছাড়িয়ে পানিতে ধুয়ে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।
- প্রয়োজন মত নরম না হলে ভিজিয়ে রাখা পানি থেকে অল্প পরিমাণ পানি নিয়ে সিদ্ধ করতে হবে।
- ঠান্ডা হলে কাঠের হাতল/হাত দিয়ে কচলিয়ে মন্ড করতে হবে।
- সকল মসলা ভেজে গুড়া করতে হবে।
- চিনি ও মন্ড এক সাথে মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে।
- কিছুটা ঘন হলে (টিএসএস ৫৫০ ব্রিক্স) সকল মসলা ও লবণ মিশিয়ে দিতে হবে।
- আরও ঘন (টিএসএস ৫৮০ ব্রিক্স) হলে অ্যাসেটিক এসিড যোগ করতে হবে।
- অন্য একটি পাত্রে সরিষার তৈল গরম করে চাটনীতে মিশাতে হবে।
- পুরোপুরি ঘন (টিএসএস ৬০০ ব্রিক্স) হলে সামান্য পানিতে সোডিয়াম বেনজয়েট গুলিয়ে চাটনীতে মিশাতে হবে।
- জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরে ঠান্ডা হলে উপরে মোমের প্রলেপ দিয়ে ছিপি এঁটে সংরক্ষণ করতে হবে।

সারণী-১ ঃ কুলের চাটনী তৈরির উপকরণ

উপকরণ	পরিমান
শুকনা কুল	০১ কেজি
চিনি	৭০০ গ্রাম
লবণ	৩৫ গ্রাম
সরিষার তেল	৫০ মিলি
মরিচের গুঁড়া	০৫ গ্রাম
সরিষার গুঁড়া	১০ গ্রাম
মৌরি	০৪ গ্রাম
গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড	০৫ মিলি
কালজিরা	০৫ গ্রাম
এলাচ	০১ গ্রাম
দারুচিনি	০১ গ্রাম
লবঙ্গ	০১ গ্রাম
জায়ফল	০১টি
জিরা	০৩ গ্রাম
জৈত্রী	০১ গ্রাম
সোডিয়াম বেনজয়েট	০১ গ্রাম



চিত্র ঃ কুলের চাটনী

জলপাই এর মিষ্টি চাটনী

বাংলাদেশের সর্বত্রই জলপাই জন্মে থাকে। কাঁচা এবং পাকা উভয় অবস্থাতেই জলপাই খাওয়া যায়। জলপাইয়ে প্রচুর পুষ্টি উপাদান আছে। জলপাই এর মিষ্টি চাটনী খুবই উপাদেয় এবং সহজেই তৈরি করা যায়। বাণিজ্যিকভাবে জলপাই চাটনী তৈরির মাধ্যমে আয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রস্তুত প্রণালী

- পরিপক্ক জলপাই পনিতে ধুয়ে লম্বালম্বি দু'পাশ দিয়ে কেটে স্লাইস করতে হবে।
- রসুন ও আদার পেস্ট তৈরি করতে হবে। অন্যান্য মসলাগুলো ভেজে ভালভাবে পিষিয়ে নিতে হবে।
- আদা রসুনের পেস্টসহ মরিচের গুঁড়া একটা কড়াইতে ৫০ মিলি সরিষার তেলে কষিয়ে/ভেজে নিতে হবে।
- কড়াইতে স্লাইসগুলো ঢেলে নাড়তে হবে এবং জলপাই নরম হয়ে আসলে এতে চিনি ও লবণ মিশাতে হবে।
- পাল্প ঘন হয়ে আসলে বাকি মশলা (ভেজে গুঁড়া করা মশলা) কড়াইতে পাল্পের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
- অতঃপর অ্যাসেটিক এসিড যোগ করে তাপ দিতে হবে।
- কাঙ্খিত ঘনত্বে এলে জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরে ঠান্ডা হলে উপরিভাগে মোমের প্রলেপ দিয়ে ছিপি লাগিয়ে পরিস্কার ও শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

সারণী-১ ঃ জলপাই এর মিষ্টি চাটনী তৈরির উপকরণ

উপকরণ	পরিমান
জলপাই টুকরা	১.০ কেজি
লবণ	৪০ গ্রাম
আদা	১০ গ্রাম
মরিচের গুঁড়া	২০ গ্রাম
রসুন	৫ গ্রাম
সরিষার তেল	১০ গ্রাম
দারুচিনি	০১ গ্রাম
গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড	০৪ মিলি
চিনি	৫০০ গ্রাম
এলাচ	০১ গ্রাম
মৌরি	০২ গ্রাম
লবঙ্গ	০১ গ্রাম
জায়ফল	০১ গ্রাম
জিরা	০২ গ্রাম
জৈত্রী	০১ গ্রাম



চিত্র ঃ জলপাই এর মিষ্টি চাটনী

মিষ্টি আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ

মিষ্টি আলু বিশেষ করে কমলা সুন্দরী, বারি মিষ্টি আলু-৪ ও ৫ এ প্রচুর পরিমান ক্যারোটিন আছে যা ভিটামিন "এ" এর একাট ভাল উৎস। মিষ্টি আলু স্বাভাবিক অবস্থায় চিপস্, জ্যাম, জেলী, সস করা যায়। কিন্তু প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে চিপস, শুকনো চিপস, জ্যাম, জেলী ও সস করা যায় যা শহরে ও গ্রামে ঘরে তৈরি করে খাওয়া যায় এবং বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা যায়। দৌলতপুরী ও তৃপ্তি থেকে ভাল চিপস হালুয়া তৈরি করা যায়। কমলা সুন্দরী, বারি মিষ্টি আলু-৪ ও ৫ থেকে জ্যাম, জেলী ও সস তৈরি করা হয়।

সারনী - ১ ঃ মিষ্টি আলুর তৈরীর উপকরণ

টিকার নাম	টিকা দেয়ার সময়/বয়স
মিষ্টি আলু	১ কেজি (৪ কাপ)
সাইট্রিক এসিড/লেবুর রস	১০ গ্রাম (২ চা চামচ)
চিনি/গুড়	৯০০-১০০০ গ্রাম (৪ কাপ)
পেকটিন	৫ গ্রাম (১ চা চামচ/পেয়ারার সিদ্ধরস ২৫০ মিলি)

বারি মিষ্টি আলু-৪ ও ৫ জাতটি সুস্বাদু সস ও জ্যাম তৈরির জন্য খুবই উপযোগী

জ্যাম তৈরির পদ্ধতি

- মিষ্টি আলু ধুয়ে ও টুকরো করে পানিতে সিদ্ধ করতে হবে।
- সিদ্ধ মিষ্টি আলুর টুকরো হাত দিয়ে মেখে বা পাটায় বেটে মন্ড করতে হবে।
- এরপর মিষ্টি আলুর মন্ড চিনি/গুড় দিয়ে জ্বাল দিতে হবে।
- রস ঘন হয়ে আসলে লেবুর রস মিশিয়ে আরও ৪-৫ মিনিট জ্বাল দিতে হবে।
- এ রস পানির মধ্যে জমে গেলে বুঝতে হবে যে জ্যাম তৈরি হয়ে গেছে।
- রান্নার ৫ মিনিটের মধ্যে জীবাণুমুক্ত কাঁচের পাত্রে ভর্তি করে ঠান্ডা করতে হবে।
- জ্যাম ঠান্ডা হলে বোতলের মুখে গরম মোম ঢেলে দিতে হবে।
- জ্যাম ১ বছরের বেশি সময় সংরক্ষণ করা যায়।
- এই জ্যাম ভিটামিন 'এ' এবং ক্যালোরী সরবরাহ করে।

সারনী - ২ ঃ মিষ্টি আলুর সস তৈরীর উপকরণ

উপকরণ	পরিমান
মষ্টি আলুর শাঁস	১ কেজি (৪ কাপ)
কুচানো রসুন	৪০ গ্রাম (২-৩ কাপ)
কুচানো পেঁয়াজ	৫ গ্রাম (১ চামচ)
কুচানো আদা	২৫ গ্রাম (৩-৪ চামচ)
মরিচের গুড়া	৩০ গ্রাম (২ চা চামচ)
গোল মরিচ	১০ গ্রাম (২ চা চামচ)
লবণ	১০ গ্রাম (২ চা চামচ)
জিরার গুড়া	৮ গ্রাম (২ চা চামচ)
ভিনেগার/সিরকা	২৫০ গ্রাম (এক কাপ)
লবঙ্গ, দারুচিনি	৬ গ্রাম (১ চা চামচ)
পটাসিয়াম মেটাবাইসালফেট	১ চিমটি
লেবুর রস	৫ মিলি (১ চা চামচ)

সস তৈরির পদ্ধতি

- মিষ্টি আলু ধুয়ে ও খোসা ছাড়িয়ে কেটে টুকরা করতে হবে।
- টুকরা করা আলু পানিতে সিদ্ধ করতে হবে।
- মিষ্টি আলুর টুকরা হাতে বা পিষে মন্ড তৈরি করতে হবে।
- এরপর মন্ড হাতাওয়ালা পাত্রে রেখে রান্না করতে হবে।
- মসলা ও লবণ একটি পাতলা কাপড়ের ছোট পুটলীতে নিয়ে ফুটন্ত মন্ডের ভিতরে রাখতে হবে।
- যতক্ষণ না সস প্রয়োজনীয় ঘন হয় ততক্ষণ রান্না করতে হবে।
- সসে ভিনেগার দিতে হবে।
- সংরক্ষণের জন্য পটাসিয়াম মেটাবাইসালফেট বা লেবুর রস মিশাতে হবে।
- বোতল ঠান্ডা হলে ক্যাপ লাগাতে হবে।
- এরপর গরম মোম দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হবে।
- বোতল ঠান্ডা স্থানে ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- মিষ্টি আলু সসে ভিটামিন 'এ' এবং ক্যালেরী বিদ্যমান থাকে।

বসতবাড়িতে পাটি তৈরি

ভূমিহীন, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার এ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন যাদের বসতবাড়িতে ছায়াযুক্ত অথবা পুকুরের পাশে ছায়াযুক্ত পতিত জায়গা আছে যেখানে পাটি গাছ লাগানো সম্ভব।



চিত্র ঃ পাটি তৈরি

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পাটি গাছ থেকে পাটি উৎপাদন এবং মোড়া তৈরির ক্ষেত্রে ধারালো অস্ত্র এবং যন্ত্র ব্যবহার করে মসৃণ ও নানান নকশী বুননের মাধ্যমে সৌন্দর্য বাড়ানো যায়।
- ভাল পাকা পাটি গাছের কান্ড, বড় কান্ড, শক্ত ঘন বুনন, মিহি বুনন ও শক্ত বাঁধনের মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্যে শক্তি বাড়ানো হয়।
- ভাল মোড়ার ক্ষেত্রে শক্ত, পাঁকা বাঁশ দিয়ে শলা তৈরি করা এবং শক্ত ও নমনীয় প্লাষ্টিক বেতী ব্যবহার করতে হবে।
- শিল্পদ্রব্য যাতে সহজে না পঁচে ও ঘুন পোকায় খেয়ে নষ্ট না করতে পারে সেজন্য ৫% বোরিক পাউডারের পানির দ্রবণে শিল্প দ্রব্য ২-৩ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখলে ভাল শোধন হয়।

পাটি তৈরির উপকরণ

পাটি গাছ, রং, প্লাষ্টিক বেতি, হাড়ি, পানি, দা ইত্যাদি

পাটি তৈরির কাজ সমূহ

- **পাটি গাছ সংগ্রহ ঃ** চৈত্র ও বৈশাখ মাসে পাটি গাছের ৩-৫ হাত লম্বা সবুজ কান্ড সংগ্রহ করা হয়। সাধারণতঃ এক থেকে দেড় বছর বয়সের গাছের কান্ড সংগ্রহ করা হয়।
- **বেতি উঠানো এবং কান্ড রং করা ঃ** সংগ্রহীত পাটিগাছের কান্ড থেকে দাঁ দিয়ে বেতি উঠানো হয় এবং যেসব বেতি রং করা হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রথমে কান্ডগুলোর উপরের সবুজ আবরণ চাকু দিয়ে ঘষে উঠিয়ে ফেলা হয়, এর পর রং করে রৌদ্রে শুকিয়ে বেতি উঠানো হয়। রং করা বেতি সিদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না।
- **পানিতে সিদ্ধ করা ঃ** পাটি গাছের কান্ড হতে ছাড়ানো বেতি ২.৫-৩.০ ঘন্টা সিদ্ধ করে নিতে হবে।
- **রৌদ্রে শুকানো ঃ** সিদ্ধ করা বেতি রৌদ্রে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। পাটি তৈরির ক্ষেত্রে বেতি যত পাতলা এবং চিকন হয় পাটি তত মসৃণ এবং শীতল হয়। সাধারণত ঃ বাজারে যেসব পাটি পাওয়া যায় সেসব পাটির বিতে ১-২ মিমি চওড়া হয়ে থাকে। হাতে বুননের মাধ্যমে এসব শীতল পাটি তৈরি করতে ১৬০-১৮০টি পাটি গাছের বেতি ব্যবহার করা হয় এবং ৩.৫-৪.৫ হাত মাপের একটি পাটি তৈরিতে ২০০-২৪০টি পাটি গাছের বেতি ব্যবহার করা হয়। একটি পাটির বেতি রং করতে ১৫-২০ টাকার রংয়ের প্রয়োজন হয়। ৩-৪ হাত মাপের একটি পাটি ৫-৬ দিন (খন্ডকালীন সময় ৪-৫ ঘন্টা/দিন/জন) এবং ৩.৫-৪.৫ হাত মাপের একটি পাটি ৫-৭ দিনে তৈরি করা যায়।

সারনী-১ ঃ পাটি তৈরির আয়-ব্যয়ের বিবরণী

আয় (টাকা)		ব্যয় (টাকা)	
৫টি পাটির মূল্য ৪৫০.০০ × ৫	২,২৫০.০০	পাটি গাছ ১২০০টি × ১.০০	১,২০০.০০
		রং	১০০.০০
		প্লাষ্টিক বেতি	১০০.০০
		অন্যান্য	১০০.০০
মোট আয়	২,২৫০.০০	মোট ব্যয়	১,৪৭০.০০
নীট মুনাফা (২,২৫০.০০ - ১,৪৭০.০০) = ৭৮০.০০ টাকা			

বসতবাড়িতে মোড়া তৈরি

ভূমিহীন, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার এ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন। আপদকালীন ও অবসর সময়ে মহিলারা মোড়া তৈরি করে বাড়তি আয় করতে পারেন।

মোড়া তৈরির উপকরণ

বাঁশ, সুতলী, বিভিন্ন রং এর প্লাষ্টিক বেতি, দা, রিকশার পুরানো টায়ার ইত্যাদি

শলাকা/কাঠি তৈরি

সাধারণতঃ মজবুত টিকসই মোড়া তৈরির ক্ষেত্রে পাকা বাঁশের শক্ত শলাকা ব্যবহার করা হয়। তাই সংগৃহীত পরিপক্ক বাঁশ থেকে দা দিয়ে কেটে ৩০-৪৫ সেমি মাপের শলাকা তৈরি করা হয়। বাঁশ ভেদে প্রতিটি বাঁশ হতে ৪০০-৬০০টি শলাকা তৈরি হয়। প্রতিটি শলাকার পরিধি ৪-৭ মিমি।



চিত্র ঃ মোড়া তৈরি

মোড়া তৈরির পদ্ধতি

মোড়া তৈরিতে শক্ত শলাকা ব্যবহার করা হয় এবং মোড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে বিভিন্ন রং এর প্লাষ্টিক বেতি ব্যবহার করা হয়। প্রথমে বাঁশের শক্ত মজবুত শলাকাগুলো মাটিতে রেখে আড়াআড়ি করে একটার পর একটা শলাকা গেথে মাঝখানে প্লাষ্টিক বেতি দিয়ে বেধে মোড়ার কাঠামো তৈরি করা হয়। এরপর উপরে সুতলী দিয়ে টাক বাধ দেয়া হয়। উপর এবং নিচে টায়ার পেঁচিয়ে বেধে উপরে প্লাষ্টিক বেতি দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইনের বুনন করা একটি মোড়া বানাতে ২-৩ দিন সময় লাগে (খন্ডকালীন সময়ে ৩-৪ ঘন্টা/জন/দিন)। প্রতিটি মোড়া তৈরিতে ২০০ শলাকা, ১৫০ গ্রাম রঙিন বেতি এবং ২ টাকার সুতলী ব্যবহার করা হয়।

সারনী-১ ঃ মোড়া তৈরীর আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী

(ক) ব্যয়	টাকা	(খ) আয়	টাকা
মুলি বাঁশ ৫টি × ২৫	১২৫.০০	মোড়া বিক্রি ঃ ১০টি × ৮০.০০ =	৮০০.০০ টাকা
রঙিন প্লাষ্টিক বেতি ১.৫ কেজি × ১০০.০০	১৫০.০০		
সুতলী	৪০.০০		
পুরোনো টায়ার ৫টি × ২০.০	১০০.০০		
মোট ব্যয়	৪১৫.০০	মোট আয়	৮০০.০০ টাকা
নীট মুনাফা (খ-ক) = ৩৭৫.০০ টাকা			

তথ্যনির্দেশ

১. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকায় ৭-৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ তরিখে ২ দিনব্যাপি কর্মশালায় বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ।

২. পশুসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা, ২০০৮, পশুসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।

৩. ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ২০০৫, পোষ্টহারভেষ্ট টেকনোলজী বিভাগ,বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর, পৃ. ১-২২।

৪. নির্বাচিত কৃষি প্রযুক্তি ম্যানুয়েল, ২০০৮, কৃষি প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (এটিটি), বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা কাউন্সিল, ঢাকা-১২১৫, পৃ. ১-২৯।

৫. বিএসআরআই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচণ কর্মশালার নিবন্ধনসমূহ, ২০০৫, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর, পৃ. ১-১৩৯।

৬. গয়েশপুর সবজি উৎপাদন মডেল, ২০০৬, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, পাবনা-৬৬০০, পৃ.১-৩১।

৭. কেঁচোসার, গ্রমীণ শক্তি, প্রাকটিক্যাল এ্যাকশন এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, পৃ.১-২৪।

৮. বাংলাদেশে মাশরুম চাষের কলাকৌশল, ২০১০, কৃষি প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (এটিটি), বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা কাউন্সিল, ঢাকা-১২১৫, পৃ. ১-০৮।

৯. মৌমাছি পালন, ১৯৯৩, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর, পৃ. ১-২৩।

১০. উদ্যানতাত্বিক ফসলের সংপ্রত্তোর প্রযুক্তি, উদ্যান গবেষনা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

১১. উন্নত চুলা, জ্বালানী গবেষণা ও উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট, বিসিএসআইআর, ঢাকা।

১২. কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, ১৯৯৯, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

১৩. মৎস্য উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা, মৎস্য পক্ষ-২০০২, বিশেষ প্রকাশনা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৪. মজিদ, এমএ ২০০২, A guide book on fish production technology, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট- ময়মনসিংহ, পৃষ্ঠা-৬৬।















